إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

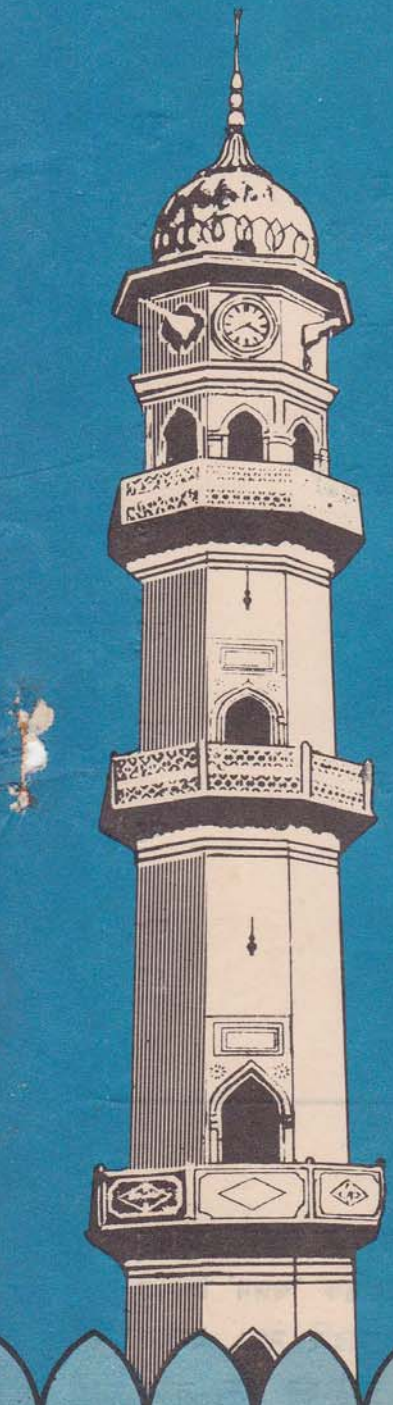

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই।

–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ৯ম ও ১০ম সংখ্যা
৭ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪১২ হিঃ ।। ৩০শে কার্তিক, ১৩৯৮ বাংলা ।। ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯১ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান
অনুবাদক : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী ৪

জুমুআর খুৎবাঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৬

জেহাদ বিল্‌ কুরআন
জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান ২০

'সত্যবাক'-এর মিথ্যা ভাষণ
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৪

'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম'
অধ্যাপক যতীন সরকার ৩৪

'বিবিধ বচন'
স্বজন ৩৮

সংবাদ ৪২

সম্পাদকীয়

সাধারণ মঞ্চ

পাঠক আশা করি 'দৈনিক আজকের কাগজে' প্রাবন্ধিক যতীন সরকার রচিত 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম' এবং 'দৈনিক সংগ্রামের' প্রাবন্ধিক 'স্বজন' লিখিত 'বিবিধ বচন' পাঠ করেছেন। আমরা লেখকদ্বয়কে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না। লেখক 'স্বজন' অকপটে অধ্যাপক যতীন সরকারের কথায় সায় দিয়ে স্বীকার করেছেন যে, সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ আবির্ভূত রহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু মুসলমানদের

(অবশিষ্টাংশ ৪৭ পাতায় দেখুন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯১ইং : ১৫ নবুওয়াত, ১৩৭০ হিঃ শামসী : ৩০শে কার্তিক, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল-বাকারা-২

১৯৮। হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত; অতএব, যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রীগমন (২৩৩) না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ উহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় লইও, স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোক সকল! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

১৯৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নয় যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের (২৩৪) অনুসন্ধান কর। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত (২৩৫) হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের (২৩৬) নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে তোমরা তাঁহাকে স্মরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

২৩৩। 'রাফাস' শব্দটি ঘৃণা গালাগালিপূর্ণ, ইতর কথাবার্তা ও যৌন ইত্‌রামীকে বুঝাইয়া থাকে। 'ফুসুক' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র আইনের এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্রের অবাধ্যতাকে বুঝায়। আর 'জিদাল' শব্দ দ্বারা সঙ্গী, সাথী, সহযাত্রী ও প্রতিবেশীর ঝগড়া বিবাদকে বুঝাইয়া থাকে।

২৩৪। মক্কার তীর্থ গমনে যাহাতে খুব বেশী বেশী লোক অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই জন্য কুরআনে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, তীর্থযাত্রী এতদসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারে। যাহারা নগদ টাকা পয়সা বেশী নিতে পারে না, তাহারা বিক্রয়যোগ্য কিছু জিনিস পত্র সাথে লইয়া যাইতে পারিবে, যাহা বিক্রয় করিয়া পথের খরচাদি ভালভাবে মিটাইতে পারিবে।

২০৩। অতঃপর, (২৩৭) যেখান হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন (২৩৮) করে তোমরাও সেখান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২৩৫। 'আরাফাত' একটি বিরাট সমতল বা উপত্যকাভূমি। ইহা মক্কার নিকটেই। হজ্জযাত্রীগণ যুলহজ্জ মাসের নবম দিনের শেষাংশটা সেখানে কাটান। মক্কা হইতে মাত্র ৯ (নয়) মাইল দূরবর্তী এই স্থানে নবম দিনের শেষাংশে এখানে অবস্থান করা হজ্জের অংশ বিশেষ, যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওকুফ' বলা হয়। "আরাফাত" একটি যুগ্ম শব্দ, যাহার অর্থ পরিচয় বা জ্ঞান লাভের উপায়, পবিত্র স্থান।

২৩৬। 'মাশ্‌আরুল হারাম' মুযদালিফার একটি ছোট পাহাড় যাহা মক্কা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে রসূল করীম (সাঃ) সন্ধ্যার ও রাত্রির নামাযের পর, সারা রাত্রি ও সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দোয়ায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই স্থানটি হজ্জের সময়ে, ধ্যান উপাসনা ও দোয়া-দরূদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত। মক্কা হইতে ইহার দূরত্ব ৬ মাইল,

২৩৭। যদি এখানে 'সুম্মা' অর্থে ধরা হয় 'এবং' আর প্রত্যাবর্তন অর্থে ধরা হয় 'আরাফাত' হইতে প্রত্যাবর্তন, তাহা হইলে 'আন্‌নাস'-এর অর্থ দাঁড়াইবে' 'অন্য লোক'। কিন্তু যদি 'সুম্মার' অর্থ ধরা হয় 'অতঃপর' আর প্রত্যাবর্তনের' অর্থ ধরা হয় 'মাশাআরুল হারাম হইতে প্রত্যাবর্তন, তখন 'আন নাস'-এর অর্থ দাঁড়াইবে "সকল লোক" এবং এই উভয় অর্থই আরবী ভাষা অনুযায়ী শুদ্ধ।

২৩৮। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে কুরাইশ ও বনু কিনানা গোত্রের লোকেরা অন্যান্য হজ্জ যাত্রীদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যাইত না। তাহারা মাশ্‌আরুল হারামে থামিয়া যাইত এবং আরাফাত হইতে প্রত্যাগত লোকদের সহিত যোগদান করিবার জন্য অপেক্ষা করিত। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহারাও যেন মাশআরুল হারামে না থামিয়া অন্যান্য সকলের সাথে আরাফাত পর্যন্ত যায় এবং অন্যান্য লোক যাহা পালন করে, তাহারাও যেন সেই সব পালন করে। আরাফাত হইতে ফিরার পথে মাশআরুল হারামে পৌঁছিয়া হজ্জ যাত্রীরা 'মীনায়' গমন করিবে। সেখানে কুরবানীর পশু যবহ করার পর, 'ইহরাম' অবস্থার অবসান হইবে।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী
সদর মুরব্বী

কুরআন

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ○ انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا ○

অর্থ : এবং তাহারা তাঁহারই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায় ; (এবং তাহাদিগকে বলে) 'আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না। (সূরা দাহর : ৯-১০ আয়াত)

হাদীস

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدو الرحمان أطعموا الطعام و افشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام -

(ترمذى ابواب الا طعمة باب ماجاء فى أطعام الطعام)

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বলেছেন, তোমরা রহমান আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তোমরা খাবার খাওয়াও আর সালামের প্রসারতা দান করো, তোমরা শান্তির দোয়া ছড়াবে তাহলে তোমরা চির শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই হাদীসে রহমান খোদা অর্থাৎ অযাচিত অসীম দাতা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা ও ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বলছেন, রহমান খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক পরিণাম হচ্ছে তাঁর বান্দাদের সাথেও তোমাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সেই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে ও সালামের প্রচলন ও প্রসারতার মাধ্যমে।

একথা প্রণিধানযোগ্য যে, হুযূর (সাঃ) এস্থলে কেবল ক্ষুধার্তদেরই খাওয়াতে বলেন নি, বরং বলেছেন সাধারণভাবে খাওয়ানোর অভ্যোস গড়ে তুলো। ক্ষুধার্তদের অবশ্যই খাওয়ানোর চেষ্টা করা দরকার। সেই সাথে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়ানোরও অভ্যোস করতে হবে। খাবার খাওয়ানো আর কিছুই নয় আন্তরিকতার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের একাত্মতা ও ভালবাসা বাড়বে। তবে এ বিষয়ে হুযূর (সাঃ) আড়ম্বরতা করতে নিষেধ করেছেন। যা আছে তাই মেহমানকে পরিবেশন করার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। তা না করলে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

(অবশিষ্টাংশ ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর
অমৃতবাণী

অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম
সদর মুরব্বী

"তাহাজ্জুদের গুরুত্ব

সারাটা জীবন যদি পার্থিব কাজেই কেটে গেল তা হলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে ?

তাহাজ্জুদের জন্য অবশ্যই উঠ ! উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আদায় কর। মধ্যবর্তী নামায গুলোর ব্যাপারে চাকুরীর কারণে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে যায়। রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ্‌-তা'লা, নামায সময় মত আদায় করা উচিত। যোহর ও আসরের নামায কখনও কখনও জমা করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা জানতেন যে, মানুষ দুর্বল সেজন্যে এই সুযোগ রেখে দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগ তিন ওয়াক্ত নামাযের জমা করার বেলায় হতে পারে না।

যেখানে চাকুরী বা অন্যান্য অনেক ব্যাপারে মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে সেখানে খোদার খাতিরে দুঃখ সহ্য করা কতই না সুখের বিষয়।

নবী ও সিদ্দীকদের কাজ

যারা সত্যবাদিতার জন্য দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করে তারা মানুষের দৃষ্টিতেও প্রিয় হয়ে থাকে আর এই কাজই নবী ও সিদ্দীকদের কাজ যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে পার্থিব ক্ষতিকে গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌তা'লা কখনও তাদের ঋণ স্বীয় স্কন্ধে রাখেন না বরং পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন।

মানুষ যেন কপটতায় অভ্যস্ত না হয়

মানুষের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন কপটতায় অভ্যস্ত না হয় যেমন এক হিন্দু (শাসক হোক বা কর্মকর্তা) যদি বলে যে, রাম ও রহীম একই ব্যক্তি, এমন মুহূর্তে যেন তার সাথে হাঁ হাঁ না করা হয়। খোদাতা'লা শিষ্টাচারে বাধা দেন না। ভদ্রতার সাথে যেন উত্তর দেয়া হয়। প্রজ্ঞার কথা ইহা নয় যে, এমন সব কথা বলা হয় যাতে অনর্থক ভাবাবেগের উদ্রেক হয় এবং বিবাদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্যকে গোপন করা উচিত নয়। কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সাথে হাঁ হাঁ করলে (পরিণামে) মানুষ কাফের হয়ে যায়

یار غالب شو کہ تا غالب شوی

অর্থঃ বিজয়ীর বন্ধু হও যেন তুমিও বিজয়ী হতে পারো।

খোদাতা'লার প্রকৃত সম্মান করা উচিত। আমাদের ধর্মের কোন কথা শিষ্টাচারের পরিপন্থী নয়।

ইসলামের উপর নির্যাতন

ইসলাম! ইসলাম চিরদিন ধরে নির্যাতিত হয়ে আসছে। কোন সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হলে বড় ভাই বয়োজ্যেষ্ঠ ও পূর্বে জন্মগ্রহণ করার কারণে অনর্থক ছোট ভাইয়ের উপর নির্যাতন করে কেননা সে জন্মের দিক দিয়ে প্রথম হওয়ার কারণে নিজের অধিকারকে বেশী মনে করে অথচ উভয়ের অধিকার সমান। অনুরূপভাবে ইসলামের উপর নির্যাতন হচ্ছে। ইসলাম সকল ধর্মের শেষে এসেছে। যেমন মূর্খ তার শুভাকাংখির সাথে শত্রুতা করে তেমনই ইসলাম যখন সকল ধর্মের ভ্রান্তি ধরিয়ে দেয় তারা ক্রোধান্বিত হয়ে যায় কেননা শ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণা তাদের সকলের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। মানুষ জনবল ও ধনসম্পদের আধিক্যের কারণে গর্বিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন দরিদ্র সংখ্যা লঘু এবং নূতন জাতির নেতা ছিলেন। সেজন্য প্রথম প্রথমই বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে মানে নি। সত্য সর্বদা নির্যাতিত থাকে।

ইসলাম কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে মন্দ বলার অনুমতি দেয় না

ইসলাম এত পবিত্র ধর্ম যে, কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে মন্দ বলার অনুমতি দেয় না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা হঠাৎ করে গালি দিতে উদ্যত হয়। দেখ, খৃষ্ট সমাজ আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কত গালি দিচ্ছে। যদি এখন আঁ-হযরত (সাঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর পার্থিব মর্যাদাকে দেখে তারা কোন কথা উচ্চারণ করতে সাহস করতো না বরং সহস্র গুণ বেশী সম্মান প্রদর্শন করতো। কাবুলের আমীর ও রোমের বাদশাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নগণ্য উম্মত, তাঁদের গালি দেয়া যায় না। তাঁদের প্রতি বেআদবী প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) এর নাম উচ্চারণ করলেই সহস্র সহস্র গালি শুনিয়ে দেয়। ইসলাম ভিন্ন জাতিবর্গের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছে যে, সকল নবী ও পুস্তককে নিষ্কলংক প্রমাণ করেছে কিন্তু স্বয়ং ইসলাম নির্যাতিত। ইসলামের সার কথা لا إله إلا الله অন্য ধর্মে নেই।"

(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭-৮)

(৩য় পাতার পর)

সালাম আদান প্রদান শান্তি ও দোয়ার ছড়াছড়ি বিশেষ। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মনে একে অপরের প্রতি ভালবাসা বাড়ে। দুনিয়া একটি শান্তির নীড়ে পরিণত হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে উপরোক্ত নির্দেশনা পালন করে জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করার তৌফীক দান করুন। (আমীন)।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২রা , আগষ্ট, ১৯৯১ইং তারিখে ইসলামাবাদ, ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

নামায পাঁচ বেলা আমাদের এ পয়গাম জানায় যে, দুই নামাযের মাঝের সময়টাতে তোমরা পুণ্য কাজ কোন করেছ কি না? যদি দুই নামাযের মধ্যকালীন সময়ে তোমরা পুণ্যের কোন ভাল কথাও বলে থাক তাহলে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনের বাণী অনুযায়ী তাও একটি হাদিয়া বা উপহার বিশেষ।

মরহুম চৌধুরী হেদায়াতুল্লাহ বাঙ্গভী সাহেবের অশেষ আন্তরিকতা ও প্রভূত খেদমতের জন্যে হুযূর (আইঃ) কর্তৃক ভূঁয়সী প্রশংসা।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন : নামায প্রসঙ্গে যে সকল খোৎবা দেয়া হচ্ছে যথাসম্ভব আজকেরটি হবে সে সম্বন্ধীয় শেষ খোৎবা। আমি বিগত খোৎবায় ''আত্তাহিইয়্যাত''-এর উপর বক্তব্য শেষ করেছিলাম। কিন্তু 'আত্তাহিইয়্যাত'-এর বিষয়বস্তু তখনও অব্যাহত ছিল। সেজন্যে 'আত্তাহিইয়্যাত' থেকেই আমি সে বিষয়টির পুনরায় অবতারণা করছি।

'আত্তাহিইয়্যাত'-এর অর্থ হলো উপহারসমূহ। আর উপহারের সম্পর্ক হলো মানুষের অপরাপর সাধারণ নেয়া-দেয়ার ব্যাপারাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র (ধরণের)। এটিতে মানুষ কোন জিনিস কোন বন্ধুর অথবা কোন বড় জনের সমীপে এ উদ্দেশ্যে পেশ করে যে, এর ফলশ্রুতিতে সে যেন (বিনিময়ে) অনুরূপ কোন জিনিস না পায় বরং তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। আর এটাই হলো উপহারের মর্মার্থ। উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে আর্থিক কুরবানীই খোদার পথে আমরা পেশ করে থাকি, সেগুলোর ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হারে ফেরৎ নেয়ার বিষয়বস্তু কুরবানীকারী ব্যক্তির অন্তরে বা মন-মানসিকতায় (খুণাক্ষরেও) থাকা উচিত নয়। উক্ত বিষয় বস্তুটিই কুরআন করীম এইরূপে পেশ করে যে, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ , অর্থাৎ তুমি এই ভেবে বা মনোভাব নিয়ে ইহসান (বা কারও উপকার) করবে না যে, তুমি (তাঁর বিনিময়ে) বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরৎ নিবে। কাজেই আপনাদেরকে যদিও বার বারই এ কথা বুঝানো হয় যে, খোদাতা'লা হরহামেশাই বর্দ্ধিত হারে ফেরত দান করেন। কিন্তু

এ নিয়্যতের সাথে যদি খোদার হুযূরে (বা উদ্দেশ্যে) পেশ করা হয় যে, অধিকতর পাওয়া যাবে তাহলে এটা হবে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ সওদা এবং নিজের কুরবানীকে তোহ্‌ফা বা উপহারের পরিবর্তে সাধারণ একটা ব্যবসায়ে পরিণত করার নামান্তর। খোদাতা'লার সাথে ব্যবসাসুলভ ব্যাপার তো চলে বটে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের অর্থ ভিন্নতর। অতএব, 'আত্তাহিইয়্যাত' আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, খোদার হুযূরে তোমরা যা কিছুই পেশ কর তা এই নিয়্যত সহকারেই পেশ করবে যে, এর বিনিময়ে যেন 'জাযা'বা পুরস্কার লাভ হয়। এবং সে পুরস্কারটি হোক সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা সুলভ পুরস্কার, পার্থিব প্রতিদান নয়। এই নিয়্যতের মাধ্যমে তোহ্‌ফা বা উপহারের বিষয়বস্তু বুঝে নেয়ার পর আমাদের যাবতীয় কুরবানীর উপর এক অসাধারণ প্রভাব পড়বে। সুতরাং নামায আমাদেরকে কেবল মালি কুরবানী সম্বন্ধেই (তার আমল স্বরূপ ও তত্ত্ব) বুঝিয়ে দেয় নি, বরং দৈহিক কুরবানীর বিষয়-ও বুঝিয়ে দিয়েছে। অতএব, বলা হয়েছে 'আত্তাহিইয়্যাতুলিল্লাহে ওস্‌সালাওয়াতু ওত্‌-তাইয়্যেবাতু''।

'আস্‌সালাওয়াত' বলতে দৈহিক কুরবানীকে বুঝায় এবং 'আত্তাইয়েবাত'' বলতে পবিত্র বস্তু ও বিষয়সমূহকে বুঝায়, সেগুলো উক্তি স্বরূপ (মৌখিক) হোক কিংবা কর্মস্বরূপ হোক কিংবা আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক এবং যা আমরা (ঐকান্তিকরূপে) খোদার হুযূরে পেশ করে থাকি। অতএব, এইদিক থেকে খোদাতা'লার সাথে মানুষের যাবতীয় সম্পর্কাবলী তোহ্‌ফা ও উপহার পেশ করার (তুল্য) সম্পর্কাবলী স্বরূপ হয়ে যায়। যদি তোহ্‌ফা গ্রহণ করেন তার দু'টি অবস্থান হয়ে থাকে। এক তো হলো যে, মানুষ কোন বড় জনের কাছ থেকে তোহ্‌ফা (উপহার) গ্রহণ করে এমতাবস্থায় যে, তার মোকাবেলায় সে আর্থিক দিক থেকেও এবং অন্যান্য দিক থেকেও নিম্নতর হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তি যদিও তার অন্তরে (মানসিকভাবে) কোন রকমে বহুগুণ বাড়িয়ে (তাঁর সমীপে) পেশ করার প্রচুর বাসনা ও আকাঙ্খা পোষণ করে; কিন্তু সে তার বাসনা পূরণ করতে পারে না। সেজন্যে যে ব্যক্তির সমীপে সে তোহ্‌ফা পেশ করতে চায় তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে মর্যাদাবান এবং মহানুভব হন, তাহলে তার তুচ্ছ তোহ্‌ফা বিবেক ও আন্তরিকতার (প্রেক্ষিতে) অনেক গুণে বাড়িয়ে (মূল্যবান আর তোহ্‌ফা হিসাবে) ধরে নেন, কবুল করেন। এতদ্ব্যতীত সেই গরীবের অন্তরের বাসনা পূর্ণ হবার আর কোন উপায় থাকে না। অন্য কথায়, তার অন্তরের বাসনাও কোন বড় লোকের দয়া ও মহানুভবতার উপরে নির্ভরশীল। অতএব, এ দিক থেকে খোদাতা'লাকে উপহার দেয়ার যদ্দুর সম্পর্ক, তা একমাত্র এ (ধরণের) সম্পর্কসূত্রটিই নিরূপিত হয়। এরূপ একজন অস্তিত্বকে তোহ্‌ফা পেশ করা হচ্ছে যিনি সকল দিক দিয়েই উচ্চ ও মহান এবং তাঁর (কোন অভাব এবং) প্রয়োজন নেই—আমরা তাঁকে তোহ্‌ফা পেশ করার মত সামর্থ্যও রাখি না, কিন্তু তিনি যখন (তা) কবুল করেন তখন দয়া ও মহানুভবতার ভিত্তি ও ফলশ্রুতিতে এইরূপে কবুল করেন

যেন তোমরা বড় একটা কিছু করেছ এবং যেহেতু তিনি অধিক দানের ক্ষমতা রাখেন সেহেতু তিনি নিজ গুণে অধিক দেন। অন্যথা, যে পেশ করে সে তার দারিদ্র ও অপ্রতুলতার বিষয়ে সচেতন ছিল, সে তো লজ্জা নিয়ে পেশ করছে তা তাঁর সমীপে পেশ করার যোগ্য নয়। কেননা তার প্রিয় এতই মহান যে, তার পক্ষ থেকে যা-কিছু পেশ করা হোক না কেন তা আদৌ পেশ করার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয় না। কাজেই এরপর তার মাথায় এই খেয়াল আসা যে, সে যতটা দিবে তার চেয়ে অধিক তিনি তাকে দান করবেন—তা কত যে নীচ ও হীন ধারণা এবং তোহ্‌ফা ও উপহারের মেযাজ ও চরিত্র বিরোধী ব্যাপার। অতএব, খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কাবলীর ক্ষেত্রে এমন কোন সওদা বা দর কষাকষির মনোভাব রাখবেন না যে, "এখনই দিলাম আর কালই আরো বেশী করে পেয়ে যাবো"। বরং এই মনোভাব যে, খোদার পথে যা দেয়া উচিত তার সামর্থ্য আমরা রাখি না, অথচ তোহ্‌ফা পেশ করতে মনে চায়—এমতাবস্থায় তোহ্‌ফার মোকাবেলায় যদি কেউ ফেরৎ পাওয়ার কথা বলে, তাহ'লে লজ্জায় তার মরে যাওয়ার কথা। তাই এ নিয়্যতের সঙ্গে খোদার সমীপে পেশ করা উচিত যে, "আমি দিচ্ছি তো বটে কিন্তু লজ্জাবনত হয়ে দিচ্ছি, অন্যথায় তার চেয়ে অনেক বেশী দেওয়াটাই জরুরী ছিল। আল্লাহ্‌ যেন এটা কবুল করে নেন এবং দুনিয়াতে ত্বরিৎ ফিরিয়ে না দেন।" অতএব, মাথায় এই ধারণা প্রোথিত হওয়া যে, "মানুষে তো বলে চাঁদা দিলে অনেক বরকত হয়, বেশী লাভ হয়। কিন্তু আমাদের তো কোন লাভ হলো না"—এহেন ধারণা অতি নীচ ও হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক হবে এবং এটা আর কিছু হোক তোহ্‌ফা ও উপহার বলে আর থাকবে না। এবং যেহেতু তোহ্‌ফা হিসেবে থাকবে না সেজন্যে গৃহীতও হবে না। কেননা 'আত্তাহিইয়্যাত' আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে, কেবলমাত্র তোহ্‌ফাই (আল্লাহ্‌র কাছে) গৃহীত হবে, অন্য কোন কিছু গৃহীত হবে না। যদি উপহার (হিসেবে) পেশ কর তবে তো মঞ্জুর। আর যদি উপহার না হয়ে থাকে তা'হলে তোমাদের কাজ নিয়ে তোমরা থাক। খোদা তার ধার ধারেন না। তাঁর ধারায় তিনি আছেন। এ ধরণের কুরবানীর ফলশ্রুতিতে খোদাতা'লার সাথে তোমাদের কোনই সম্পর্ক কায়েম হবে না।

দ্বিতীয় বিষয় 'আত্তাহিইয়্যাত' আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, দৈনিক আমরা খোদার সমীপে পাঁচ বার বেয়ে থাকি এবং বলি যে, "আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্‌-তাইয়েবাতু"। তবে কেউ পূর্বের তোহ্‌ফা তো পুনরায় পেশ করে না। বস্তুতঃ আমরা পাঁচ ওয়াক্ত প্রতিবারের নামাযে কোন কোন সময় একাধিক বার যখন খোদার কাছে এই নিবেদন জানাই যে, "আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লাহে.....", তখন এর অর্থ এটা তো কখনও হতে পারে না যে, আমরা (ইতোপূর্বে) একবার যে সব নেকী করেছি, যে-সব কুরবানী খোদার সমীপে পেশ করেছি, সে-গুলিকেই বারে বারে উপহার বানিয়ে পেশ করি

দিচ্ছি। কেননা দুনিয়ার (সামাজিক) সম্পর্কাবলীর ক্ষেত্রে তো মানুষ সেরূপ করে না। যদি কেউ তদ্রূপ করে তাহলে সে আস্তো পাগল ও বোকা বলেই প্রতীয়মান হবে।

অতএব, নামায পাঁচ বার এই পয়গাম জানায় যে, দুই বেলার নামাযের মাঝের সময়টাতে তোমরা কোন নেকী করেছ কি, না? যদি দুই নামাযের মধ্যকালীন সময়ে তোমরা (পুণ্যের) কোন ভাল নেক কথাও বলে থাক, তাহলেই আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু:)। এবং পবিত্র কুরআনের বাণী অনুযায়ী তাও একটি হাদিয়া বা উপহার বিশেষ, একটি নেক আমল (সৎকাজ) বটে! যদি কথাও ভাল হয় তাহলে সেটিও নেক আমলে গণ্য হয়। অতএব, উক্ত সময়টাতে অন্য কোন নেক আমল করার সুযোগ (তওফীক) নাও পাওয়া যায়, কেবল যিক্‌রে ইলাহীরই তওফীক পেয়ে থাকেন: কাউকে নেক উপদেশ দেয়ার তওফীক পেতে পারেন, অপর কাউকে না হলেও নিজের স্ত্রীকে অথবা ছেলে মেয়েদের বা সঙ্গী সাথীদেরকে কোন ভাল কথা বলার তওফীক পেতে পারেন। দু' ওয়াক্তের নামাযের মধ্যবর্তী সময়টি যে আপনাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় সে সময়টিতে কিছু না কিছু তোহ্‌ফা অবশ্য-অবশ্যই আপনাদের যোগাড় (তৈরী) করতে হবে। আর সে তোহ্‌ফাটিই খোদাতা'লার হুযুরে পেশ করা হবে। অতএব, এদিক থেকে চিন্তা করতে গিয়ে আপনারা যখন নামাযে আত্তাহিয়্যাতুলিল্লাহে....." বলেন, তখন অনেক সময়ই মন কেঁপে উঠবে যে, আমরা খালি হাতে এসেছি, আর বলছি কি না, আমরা হে খোদা! তোমার সমীপে উপহার পেশ করতে চাই, এবং উপহারও এরূপ, যা বহু বচনে অর্থাৎ উপহার সম্ভার পেশ করছি। ওয়াস্‌সালাওয়াতু"—পুণ্য কর্মের মাধ্যমে, দৈহিক কুরবানীসমূহের মাধ্যমেও, ওয়াত্তায়েবাতু" এবং পবিত্র ও উত্তম বস্তুসমূহ স্থাপন করাও। অতএব, উক্ত বিষয় বস্তুটি উপলব্ধি করার পর "আত্তাহিইয়্যাত"-এর অন্তর্নিহিত পয়গাম (শিক্ষা) অত্যন্ত ব্যাপক ও বিরাট হয়ে দাঁড়ায় এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গণ, পরিধি ও পরিসরকে ব্যাপ্ত করে ফেলে। দৈনিককার নামাযে স্মরণের দিকে মনোযোগী করে তুলে এবং আমাদেরকে জ্ঞাত করে যে, আল্লাহ্‌র নিকট কেবল ঐ নেকীগুলোই কবুল হবে যে-গুলো উপহারের রঙ-রূপ ও বৈশিষ্ট্য বহন করবে। এতদ্ব্যতিরেকে কবুল হবে না। সুতরাং لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (তোমরা কখনও পরিপূর্ণ নেকী অর্জন করতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর)—আয়াতটিতে মূলতঃ এ পয়গামই দেয়া হয়েছে যে, খোদার সমীপে যা-কিছুই পেশ কর তা হতে সর্বোত্তম কিছু যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে আসলেই তোমরা বুঝো না যে, নেকী বা পুণ্যের সংজ্ঞা কি? যদি তোমাদের সর্বোত্তম জিনিস পেশ করার মন-মানসিকতা ও স্বভাব না থাকে তাহলে তোমরা এ বিষয়টিও অনুধাবন করতে অক্ষম যে খোদার হুযুরে সর্বোত্তম বস্তু পেশ করা উচিত। এমতাবস্থায় তোমরা নেকী বা পুণ্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞাত নও! অতএব, নেকী বা উপহার উভয়ের সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন বলেই সাব্যস্ত হলো। কেননা উপহার বা তোহ্‌ফার ক্ষেত্রে মানুষ বাছাই করে ভাল জিনিস পেশ

করে থাকে। পক্ষান্তরে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বাছাই করে খারাপ জিনিস পেশ করে থাকে। যদি ট্যাক্স আদায়কারীরা গমের আকারে ট্যাক্স উসুল করতে আসে তাহলে কৃষক বাছাই করা উৎকৃষ্ট গম ট্যাক্সওলাদের হাতে তুলে দেয় এমনটি কখনও করে না। বরং যা সব চেয়ে নিকৃষ্ট পানিতে ভিজা বা কালো হয়ে গেছে এরূপ গম ট্যাক্সের মধ্যে ধরে দিবে। কিন্তু উপহারের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপার হয়ে থাকে। অতএব, "লানতানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্‌বুন" আয়াতটিতে তোহ্‌ফা বা উপহারেরই সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন—"হাত্তাতুনফিকু মিম্মা তুহিব্‌বুন"—যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভালবাসো। অতএব, মহব্বত ও ভালবাসার ফলশ্রুতিতেই তোহ্‌ফা বা উপহারের জন্ম হয় এবং যেহেতু উপহার প্রিয়ের জন্যে পেশ করা হয়। অতএব, সে সব আমলই গৃহীত হবে যে-গুলো আপনাদের কাছে প্রিয়, যে-গুলোকে আপনারা স্বগর্বে পেশ করতে পারেন। এবং সে ভাল জিনিসগুলো আর্থিক কুরবানীই হোক, অথবা অন্য আর কোন পুণ্য হোক—বাক্য বা উক্তির মাধ্যমে খোদার হাম্‌দ-এর বর্ণনা হোক, (মোট কথা) যাবতীয় ভাল জিনিস যা আপনারা পেশ করেন তা যেন এইরূপ হয় যে, সেগুলো সাজানো-গোছানো হয়, আপনাদের কাছে ভাল মনে হয় এবং আপনাদের দৃষ্টিতেও প্রিয় ও মনোরম হয়।

এরপর, অর্থাৎ 'আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তায়েবাতু'-এর পরে মানুষ (নামাযে) বলে 'আস্‌সালামু আলায়কা আইউহান্‌নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সালেহীন'—'হে নবী! আমরা আপনার উপর সালাম প্রেরণ করি।' মূলতঃ এই সালাম উপহার স্বরূপই পেশ করা হচ্ছে। কেননা খোদাতা'লাকে উপহার নিবেদনের পর সবচেয়ে প্রিয় অস্তিত্ব বলে যিনি আমাদের চোখে পড়েন তিনি হলেন হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এবং আল্লাহ্‌তা'লাকে উপহার সম্ভার পেশ করার পর যদি উপহারের হক্‌ কারও থেকে থাকে তাহলে তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তাই বটে। এ প্রসঙ্গে কোন কোন লোক অজ্ঞতাবশতঃ এই প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে "আইউহান্নাবী" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) হাযির-নাযির (সত্তায় উপস্থিত ও দ্রষ্টা হিসাবে বিদ্যমান) রয়েছেন। কেননা হাযির-নাযির সত্তাকেই সম্বোধন করা হয়। যদি এই যুক্তি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তো খোদাতা'লা আর হাযির নাযির থাকবে না। কেননা একইভাবে সম্বোধন ও সম্ভাষণপূর্বক 'আত্তাহিইয়্যাতু আলায়কা ইয়াল্লাহু' و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে: আত্তাহিইয়্যাতুলিল্লাহে ওয়াস্‌সালায়াতু ওয়াত্তাইয়েবাতু'। অতএব, খোদা গায়েব (অনুপস্থিত) হয়ে গেলেন আর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ হলেন যাযির (উপস্থিত)! বিষয়বস্তু তো (ঐ যুক্তির বদৌলতে) উলট পালট হয়ে যাবে, অর্থহীন হয়ে পড়বে। সেজন্যে এখানে যে সম্বোধনটি রয়েছে তা ভিন্ন অর্থ বহন করে। কোন কোন

সময় (বাক্যের মধ্যে) 'হাযির'কে সম্মান ও মর্যাদার ফলশ্রুতিতে 'গায়েব' (হিসেবে ব্যক্ত) করা হয় এবং গায়েবকেও সম্মান ও মর্যাদার ফলশ্রুতিতে হাযির (হিসেবে ব্যক্ত) করা হয়।' আঁ-হযরত (অর্থাৎ সেই হযরত) যে আমরা বলে থাকি তা এজন্যে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (অনুপস্থিত) ও আছেন কিন্তু সম্মানিতও। কেননা আঁ মানে (সেই) শব্দটি সম্মানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তর প্রদেশে (ইউ-পি) যখন কাউকে সম্বোধন করা হয় তখন কোন কোন সময় হাযিরকে গায়েব স্বরূপ সম্বোধন করা হয় এটা বুঝাবার জন্যে যে, আমরা আপনার অনেক সম্মান করি। আবার কোন কোন সময় গায়েবকে হাযির স্বরূপও ব্যক্ত করা হয়। সুতরাং আমরা বলে থাকি, "আপনে ইয়ে ফারমায়া।" ('আপ' মানে আপনি, কিন্তু সম্মানের উদ্দেশ্যে তিনি অর্থে ব্যবহার করা হয়—অনুবাদক)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে 'আপ' (মানে 'আপনি' তিনি অর্থে) বলছি। অথচ 'আপ' অর্থাৎ তিনি (সাঃ) গায়েব (বা অনুপস্থিত) আছেন! অতএব, এই যে, সম্মান দেখানোর পদ্ধতি (বা বাচন ভঙ্গী) তা এ অর্থেই ব্যবহৃত রয়েছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে মর্যাদা ও সম্মানের জন্যেই 'আপ' (তিনি অর্থে) বলে থাকি। অথচ তিনি গায়েব (অবর্তমান) এবং খোদা হলেন হাযির (বর্তমান উপস্থিত)। কিন্তু তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্যে গায়েব (Third Prason-এ ব্যক্ত) করা হচ্ছে। এ ধরণের বাচন ভঙ্গী দুনিয়ার (প্রায়) সকল ভাষাতেই প্রচলিত আছে। অতএব, খোদার ক্ষেত্রে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে তিনি হাযির (উপস্থিত) থাকা সত্বেও গায়েব (Third Person-এ) সম্বোধন করা হয়েছে। এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উল্লেখ করা হয়েছে মর্যাদার দিক দিয়ে খোদাতা'লার পরে দ্বিতীয় স্তরে। কিন্তু তিনি গায়েব (অনুপস্থিত) হওয়া সত্বেও 'মুখাতাবে' (অর্থাৎ Second-এ) সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই বস্তুতঃ এখানে এর বেশী অন্য কোন অর্থ বুঝায় না। নাউযুবিল্লাহ এ অর্থ বহন করে না যে, আমরা যখন (তাঁর প্রতি) সালাম প্রেরণ করি, তখন কোন কোন মুসলমান যেমন কি-না একীন করেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ান, যেন প্রত্যেক নামায আদায়কারীর সামনে সে সময় এসে দণ্ডায়মান হতে থাকেন বা হতে থাকবেন। এরূপ মনে করাটা নিছক একটা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা। বাস্তব সত্যের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। বরং এমনতর ধারণাও শির্‌কের নামান্তর। অতএব, যখনই আপনারা আসসালামু আলায়কা আইউহান নবীউ" বলেন তখন তো মর্যাদা ও সম্মানের উদ্দেশ্যেই সম্বোধন করেন। অন্যথা মূলতঃ ও বস্তুতঃ তাঁকে সামনে রেখে সম্বোধন করেন না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো "আস্‌সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সালেহীন" —অর্থাৎ আমাদের সকলের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। বস্তুতঃ মুখাতাবের উদ্দেশ্যে মুতাকাল্লিমের সিগা (Ist person) এসে থাকে। অতএব, এদিক দিয়েও 'আত্তাহিইয়্যাতে'র

মধ্যে অনবদ্য বাচনভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। গায়েবে (3rd person-এ) খোদাতা'লা প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। তারপর মুখাতাবে (2nd person-এ) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কিত বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। এরপর আমরা মুতাকাল্লামে (1st person-এ) প্রবেশ করেছি এবং নিজেদের সাথে সকল মুমেনদের শামিল করে নিয়েছি তারা উপস্থিত থাকুন বা অনুপস্থিত। কাজেই ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তুটির মধ্যে (কারও অনিবার্য) উপস্থিতির কোন বিতর্ক বা প্রসঙ্গ নেই। কেবল একটা পর্যায়ক্রমিক মর্তবা ও স্তরসমূহের প্রসঙ্গ টেনে আলোচনা করা হচ্ছে এবং এক অনবদ্য বাচনভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য রয়েছে যা এতো শান ও মর্যাদার সাথে স্বীয় দিক পরিবর্তন করে চলেছে। "ওয়া আলা' ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন"—তারপর সমগ্র নেক বান্দাদের উপর সালামতি প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে শান্তি প্রার্থনা করা হয়েছে। এ বিষয়টিতে গিয়ে সূরা ফাতেহা থেকে আমরা যে সব বিষয় বস্তুর শিক্ষা লাভ করেছিলাম তা স্বীয় পূর্ণত্বের মার্গে উপনীত হলো এবং খোদাতা'লার হামদের পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাদাহ্ ও প্রশংসা করা হলো এবং নিজেদের জন্যে এবং সমস্ত মুমেনদের জন্যে সকল প্রকার দোয়া আমরা এর মাঝে চেয়ে নিয়েছি। আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্কাবলী কায়েম করেছি। এরপর এখন এই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, "আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর এখানে কি মওকা ও উপলক্ষ্য এবং এই স্থলে এটাকে সাজানো হলো? আমি এ বিষয়ে যদ্দুর গভীর চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি তা হলো এই যে, কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মূলতঃ সূরা ফাতেহাতে বিদ্যমান রয়েছে। এবং 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"-ও সূরা ফাতেহাতেই মওজুদ আছে। বস্তুতঃ এ বিষয়-বস্তু সূরা ফাতেহারই বটে, যা এখানে এসে পূর্ণতা লাভ করে এবং আমাদেরকে এক অভিনব পদ্ধতি ধারায় জ্ঞাত করা হচ্ছে। যখন আমরা "ইয়াকানা'বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাঈন" (—একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই) বলি, তখন সেখানে যে একমাত্র স্বরূপ খোদাকেই স্বীকার করি শুধু তাই নয়, বরং "ইয়াকা (—একমাত্র) বলে গায়ব (অনুপস্থিতি)-এর অবসানও সাব্যস্ত করে থাকি। অতএব মূলতঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর বিষয়বস্তু "ইয়াক'া না'বুদু ওয়া ইয়া কানাস্‌তাঈন"-এর মধ্যে বড়ই শান ও মর্যাদার সাথে যেন ভিন্ন শব্দাবলী ও ভিন্ন বাচন ভঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়। এরপর যখন আমরা "আন্‌আম্‌তা আলায়হীম" (—যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ) এর বিষয়-বস্তুতে প্রবেশ করি তখন সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নবী যার উপর সবচেয়ে অধিক পুরস্কারসমূহের বারি বর্ষণ করা হয় তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই বটে। কাজেই নামাযের মধ্যে আমরা যখন এই দোয়া চাই যে, "ঐ সকল লোকের পথে আমাদেরকে চালাও, যাদেরকে তুমি পুরস্কারে ভূষিত করেছ" তখন (ঐ সকল পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে) সবচেয়ে সুস্পষ্টরূপে যে নবী মানুষের মন-মস্তিষ্ক, মেধা ও বুদ্ধির উপর ছেয়ে পড়েন তিনি হলেন হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তিনিই সেই, যিনি

মানব মেধা ও মস্তিষ্ককে আচ্ছাদিত ও আচ্ছন্ন করেন। তিনি সেই যিনি, মানব হৃদয় জুড়ে আসন পাতেন। এবং মূলতঃ তাঁর নামেতেই বাকী সকল নবীর নাম শামিল হয়ে যায়। অতএব, পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখের পাত্র হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। আর এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে ভিন্ন কথায় আরেকভাবে এই বলে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।" অতএব, নামায যেহেতু ধাপে ধাপে ও স্তরে স্তরে আমাদের তরবীয়ত করেছে এবং সূরা ফাতেহার বিষয় বস্তু আমাদের উপর অধিকতর বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে থাকে, সে বিষয়বস্তুর মে'রাজ (শীর্ষ-আরোহণ স্বরূপ) হলো কলেমা "আশ্‌হাদু আন্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু। কিন্তু এখানে (সুখচিত) এই কলেমা অভিজ্ঞতা লাভের পর (ব্যবহারিকরূপে) বর্ণিত হয়েছে, তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক রূপে নয়। সূরা ফাতেহা আমাদেরকে খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কাবলীর এরূপ অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়েছে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শান ও মর্যাদা আমাদের উপর এমনরূপে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, উপহার পেশ করার সময়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌তা'লার সত্তার কথা মানসপটে উপস্থিত হয়েছে এবং এর পরে পরেই স্মৃতিপটে উদিত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তা। অতএব, এই বিষয়-বস্তুটিই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। —"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।" বস্তুতপক্ষে এ দু'টিই হলো মৌলিক বিষয়—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ আর বাকী সবকিছুই অমৌলিক। বাকী সব বিষয়ই হলো এরূপ যা ঐ দু'টির সাথে বিজড়িত এবং ঐ দু'টির সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে সেগুলি অস্তিত্ব লাভ করে।

এ পর্যন্ত সূরা ফাতেহার সফর বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সফর ছিল। এর মধ্যে উপস্থিত হিসেবে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং বর্তমান অথবা ভবিষ্যতকাল হিসেবে দোয়াসমূহ চাওয়া হচ্ছে। এখন নামায আপনাদেরকে অন্যান্য কাল ও যুগের সফরও করাবে। অপরাপর দিক সম্বন্ধেও স্মৃতিসম্ভার আপনাদের জন্যে বয়ে আনবে। সুতরাং আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, শুরু থেকে শেষ অবধি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করি এবং সাক্ষ্য প্রদান করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সকল দোয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দোয়া উক্ত অর্থে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দোয়া প্রেরণের সময়েও তাঁকে অতীতকালের অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্বোধন করা হয়নি। বরং এক হাযির ও বর্তমান অস্তিত্ব হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর একটি অর্থ ইহাও (দাঁড়ায়) যে, তাঁর যুগ চির সজীব। তিনি এরূপ এক যিন্দা নবী; যিনি সময় ও যুগের দিক দিয়ে অতীত কালের মধ্যে থেকে যান নি। বরং তিনি বর্তমান কালের নবী এবং ভবিষ্যতকালেরও নবী। নামাযে 'এতক্ষণ' পর্যন্ত যে বিষয় বস্তু ছিল তা যেহেতু বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেজন্যে তাঁর (সাঃ) উল্লেখ ঐ লোকদের মধ্যে করা হয়েছে। এখন

অতীতকালের দিকেও নামায নিয়ে যায়। সুতরাং এর অব্যবহিত পরে যখন আমরা "কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ পাঠ করে দরূদ প্রেরণ করি, তখন অতীতের নেক (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের জন্যেও দোয়া চাই। সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে যিনি সবচেয়ে বেশী হক্ রাখেন যেন তাঁর প্রতি সালাম পাঠানো হয় তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) "আবুল আম্বিয়া" (নবীগণের পিতা) বলেও অভিহিত হন। হযরত ইব্রাহীম হলেন সেই বুযুর্গ নবী যাঁর সন্তান ও বংশধরদের মধ্যে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সেই বুযুর্গ নবী ; যাঁর দোয়াসমূহকে খোদাতা'লা কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন এবং আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু) তাঁর দোয়াসমূহের সর্বোত্তম ফল বিশেষ। অতএব, ঐ সম্পর্কটিকে প্রকাশ ও চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এবং এ বিষয় ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে যে, তোমরা যদি নিজেদের মুহসিন (কল্যাণকারী)-দের জন্যে দোয়া কর এবং তাঁদেরকে উপহারসমূহ পেশ কর, তাহ'লে অতীতের মহান একজন মুহসিনকেও স্মরণ রেখো। আর তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে আবার আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর প্রতি শান্তি ও সালামতি প্রেরণ কর। সালামতি তো আমরা মূলতঃ আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করছি, কিন্তু হযরত ইব্রাহীমের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সত্তা ও ব্যক্তিত্বের সাথে বেঁধে দিয়ে হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)কেও খুবই বিরাট শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ করে থাকি। এবং "কামা সাল্লায়তা"-এর মধ্যে রয়েছে অব্যাহত ও চিরসচল সালামতি। কোন অতীতের সালামতি নয়। এ বিষয়বস্তুটিও মানুষে বড়ই ভুল বুঝে। প্রকৃত ঘটনা ও সত্য এই যে, এখানে এমনটি বুঝায় না যে, হযরত ইব্রাহীমের উপর যে ভাবে কল্যাণ ও সালামতি প্রেরিত ও বর্ষিত হয়েছিল এবং তা যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, (হে খোদা !) সেরূপভাবে কল্যাণ ও সালামতি প্রেরণ ও বর্ষিত কর। যদি এইরূপ সীমিত কল্যাণ ও সালামতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে চাইতে হয়, তার চেয়ে বরং না চাওয়াই উত্তম। "কামা সাল্লায়তা"-এর মধ্যে যে অতীতের ঘটনা তা সত্যই বটে, (কিন্তু) অতীতে সে কল্যাণ ও সালামতি যেহেতু শুরু হয়েছিল, সেজন্যে 'মাযী' তথা অতীতকালের সিগা বলা হয়েছে। নচেৎ এর দ্বারা কখনও ইহা বুঝায় না যে, সে কল্যাণ ও সালামতি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সময় এসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং কুরআন করীম স্বয়ং বলছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাম সালামতির সহিত কিয়ামতকাল অবধি লওয়া হবে। 'আখারীন'-পরবর্তীদের মধ্যেও সালামতির সাথে তাঁকে স্মরণ করা হবে। অতএব, এ মতে এ দরূদের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, "হে খোদা ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর চির প্রবহমান সালামতি ও কল্যাণ সমূহ সেইরূপে প্রেরণ কর, যেরূপে তুমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর চিরপ্রবহমান সালামতি

ও কল্যাণাবলী প্রেরণ করেছিলে। আর যেরূপে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যেও বড়ই শান ও মর্যাদাপূর্ণ ফলসমূহ প্রদান করেছিলে, অনুরূপভাবে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বংশধর (ও উম্মত)-দের মধ্যেও বড়ই জাঁকজমক ও মর্যাদাপূর্ণ ফলসমূহ প্রদান কর। যেরূপে তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তান এবং অনুবর্তী ও অনুগমনকারীদেরকে ভালবাস। অতএব, উক্ত অর্থ অনুযায়ী দরূদ শরীফের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ আর এক রূপ ধারণ করে ফেলে এবং ইহাতে যেহেতু অতীতের একজন মুহ্‌সিনের অর্থাৎ (হিতৈষীর) উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু নামাযের দোয়া কাল ও যুগের দিক দিয়ে (সেক্ষেত্রে) সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এর সম্পর্ক অতীত কালের সাথেও সূচিত হয়। আবার সে সম্পর্ক সূত্রে একটু সামনে গিয়ে আপনাদেরকে নিজেদের মাতা-পিতাদের জন্যেও দোয়া শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং রাব্বিজ্‌আল্‌নি মুকিমাস্‌সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি" (—হে আমার রাব্ব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার সন্তানদেরকেও") —দোয়াটিতে প্রথমে নিজের, তারপরে নিজের সন্তানদের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সকল যুগ ও কালের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। রাব্বানা তাকাব্বাল দোয়ায়ে" — হে আমাদের রব্ব! আমাদের দোয়া কবুল কর। "রাব্বিগ্‌ফিরলি ওয়ালে-ওয়ালে দাইয়া ওয়ালিল-মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব" —হে খোদা! আমাকেও ক্ষমা করে দাও এবং আমার মাতা-পিতাকেও ক্ষমা কর। অতএব, যেমন রূহানীরূপে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাতা-পিতার উল্লেখ (দরূদ শরীফে) করা হয়েছিল, তেমনি প্রার্থনাকারী (এ দোয়াটিতে) তার মাতা-পিতারও উল্লেখ করলো এই বলে যে, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে এবং আমার পিতা মাতাকেও ক্ষমা কর। অতএব, দরূদ শরীফের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ভবিষ্যত বংশধরদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক রূহানীরূপে আমাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। এ দোয়াটিতে অনুরূপভাবে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের পিতা-মাতাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে এর দোয়া শিখানো হয়েছে।

অতএব, নামায যদি আপনারা (বুঝে-সুঝে) গভীর মনোনিবেশ সহকারে আদায় করেন, তা'হলে এতে রয়েছে অপরিসীম ও অফুরন্ত বিষয় বস্তু যা কখনও শেষ হতে পারে না। প্রত্যেক বেলায় প্রত্যেক নামাযে সর্বতোভাবে সর্বতঃ হক্ আদায় হয় তা সত্যিই অসম্ভব। তাই কোথাও না কোথাও, আপনাদেরকে কোন স্থলে নামাযের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং এমনটিই আপনাদের মন-মানসিকতা ও স্বভাবসম্মত এবং সাধারণ অবস্থার সাথে খাপ খায়। প্রতিটি শব্দের উপর যদি আপনারা থামেন এবং এমনি ধারায় থেমে থেমে গভীর মনোনিবেশে নামায আদায় করেন, তা'হলে একটি মাত্র নামাযই ২৪ ঘন্টা চলতে থাকবে, এবং এটা সম্ভবপর নয়। সেজন্যে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের মধ্যে মেযাজ ও মন-মানসিকতা এরূপেই গঠন করেছেন যে তা বদলাতে থাকে। কখনও মানুষ কোন

এক বিশেষ মন-মানসিকতার সময় নামায আদায় করে থাকে। আবার অন্য সময় ভিন্ন মেযাজ ও মনোভাব নিয়ে নামায আদায় করে। কখনও সূরা ফাতেহার প্রথমাংশটিই তার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, এগিয়ে যেতে দেয় না। আবার কখনও মধ্য ভাগে এসে মন আটকায়, কখন শেষভাগে। আবার কখনও রুকূতে, আবার কখনও সিজদায়। মোট কথা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষ নিজ-নিজ মন-মানসিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে নামায থেকে স্বাদ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। অতএব, যে ব্যক্তি অনুসন্ধিৎসু হবে, সে (খোঁজ করতে করতে) যখনই তার মেযাজ ও মনের মত জিনিস কোথায়ও পেয়ে যাবে সেখানেই সে থেমে যাবে এবং সেখানে সে অধিক তৃপ্তি লাভ করবে, অনুরূপভাবে, মানুষের কোন নামাযই তৃপ্তি ও ফলবিহীন থাকতে পারে না। কিন্তু উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার মধ্য দিয়ে যদি নামায আদায় করতে হয় তা'হলে সারা জীবনের নামাযও শূন্য হবে, খালি ভাণ্ড স্বরূপই হবে—এরূপ ভাণ্ড যে, আপনারা যখন তা খোদার সামনে পেশ করবেন এবং বলবেন "আত্তাহিইয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্‌লাওয়াতু ওয়াত্তাইয়েবাতু"। তা হবে খালি 'আত্তাহিইয়্যাতু'র অন্তসারশূন্য ভাণ্ডস্বরূপ, যেগুলিতে না 'আস্‌সালাওয়াত' থাকবে আর না 'আত্তাইয়েবাত। এরূপটি বিদ্রূপ বই আর কিছুই নয়। এটা আত্ম-প্রতারণাও বটে এবং খোদাতা'লার সংগেও প্রতারণা করার চেষ্টার শামিল। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এমনটি করুন যেন আমাদের ইবাদতগুলোকে তাঁর 'যিক্‌র' (স্মরণ)-এর দ্বারা ভরে দেন এবং এরূপ যিক্‌রের দ্বারা ভরে দেন, যার জন্যে আমাদের জীবনও হয়ে উঠে আল্লাহ্‌তা'লার যিক্‌রের দ্বারা সদা সুরভিত এবং আমাদের অস্তিত্ব হয়ে যায় খোদাতা'লার অস্তিত্ব, যে তৃপ্তি লাভকারী, যেমন কিনা বলেছেন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ), আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের রঙ ও তাঁর গুণাবলী যেন আমাদের জীবন সত্তায় সঞ্চারিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। এ সেই নামায যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে খোদা-দর্শনের দর্পণে পরিণত করে। এ সেই নামায, যা (লাভ করার পর) মানুষ যত বারই নামাযে যায়, প্রতিবারই কোন-না-কোন মনি-মাণিক্য নিয়ে বের হয়। নিত্য নতুন দুর্লভ হীরক নিয়ে ফিরে আসে। কখনও এইরূপ নামায থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে না। আর যতই উন্নতি লাভ করে, ততই খোদার রঙ তার উপর পূর্বাপেক্ষা আরও ঘনীভূত হতে থাকে, ততই অধিকাররূপে সে রুকূ ও সেজদার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে থাকে এবং অহঙ্কারের পরিবর্তে বিনয় তার মধ্যে বাড়তে থাকে। খোদা করুন, আমাদের ছোটরা ও বড়রাও, বর্তমান বংশধররা ও ভবিষ্যৎ বংশধরাও যেন ঐরূপ নামাযের সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। (আমীন)।

এরপর, এখন আমি এ বিষয়টির ইতি টেনে আজ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। আমাদের একজন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি যিনি ইউ-কে জামাতের অন্যতম অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ চৌধুরী হেদায়াত উল্লাহ বাঙভী সাহেব, তিনি আজ ভোরে সহসা আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে তাঁর রফিকে-আ'লা—খোদাতা'লার সান্নিধ্যে

হাজির হয়ে গেছেন। তাঁকে আমি দীর্ঘকাল থেকে জানি। যখন আমি ছাত্র ছিলাম, তখনও তাঁর সাথে এক সংক্ষিপ্ত সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। ১৯১৬ ইং সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ছাত্র জীবনেও এবং পরেও যেখানে যে অবস্থাতেই ছিলেন সর্বদা সিলসিলার উত্তম খেদমতগুযার হিসেবে কোন না কোন ভাবে জামাতের খেদমত করার তৌফীক লাভ করতে থাকেন। দেশ-বিভাগের পূর্বে দিল্লীর কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াও ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর যখন করাচী জামাতের সংগঠন নতুন ধারায় কায়েম করা হয় তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁকে সরাসরিরূপে নিজে করাচীর মজলিসে আমেলার সদস্য পদে নিযুক্ত করেন। মোট কথা, সিলসিলার বিভিন্ন সেবকবৃন্দ রয়েছেন যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সেবা করার তৌফীক লাভ করে থাকেন। তাঁরা একজন বা দুজন নয়, আজকাল তো বরং খোদার ফযলে সহস্র সহস্র সংখ্যায় রয়েছেন, যাঁরা সেই একই প্রকারের (খেদমতসুলভ) জীবন যাপন করে থাকেন! বাঙভী সাহেব সম্বন্ধে যে বিশেষ কয়টি কথা আমি বলতে চাই তা হলো এই যে, তিনি স্বভাবতঃ সেবাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। খেদমতের স্পৃহা তার স্বভাব-চেতনায় মজ্জাগত ছিল। শুধু জামাতের সেবা নয় বরং সার্ভিস কালে যাঁর অধিকাংশ ফরেন অফিসে অতিবাহিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দূতাবাসে তিনি নিযুক্ত হতে থাকেন। তিনি তখনও এতো আন্তরিকতা সহকারে প্রত্যেকের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন যে, সে সকল অ-আহমদী অফিসারই হোক বা অধীনস্থ বা সহকর্মীই হোক যারা তাঁর সঙ্গে যে কোন জায়গায় বাস করেছেন তারা সকলেই সর্বদা তাঁকে বড়ই মহব্বতের সাথে স্মরণ করেন। আমাকে আমেরিকা থেকে এই কিছুকাল পূর্বে বাঙভী সাহেবের এক বন্ধু পত্র লিখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাকে কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বড়ই খেদমতকারী, বড়ই পরোপকারী ব্যক্তি তিনি। সুতরাং রাবওয়া থেকে আসার পরবর্তী যুগটি যাকে আমি হিজরতের যুগ বলে অভিহিত করছি, যখন আমি পাকিস্তান থেকে এসে ইংল্যাণ্ডে অস্থায়ী ভাবে বসবাস গ্রহণ করি তখন আসা মাত্র আমি সর্ব প্রথম সাধারণভাবে আহ্বান জানাই যে "মান্ আন্‌সারী ইলাল্লাহে" — কে আছ যে আল্লাহ্‌র খাতিরে, তাঁর নামে আমার সাহায্যকারী হয়ে দণ্ডায়মান হবে। তখন প্রারম্ভিক ও তাৎক্ষণিক ভাবে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাদের মধ্যে হেদায়াতুল্লাহ বাঙভী সাহেবও ছিলেন এবং তাঁর ঐ সাড়াতে এরূপ নিষ্ঠা ও সততা ছিল যে, তারপর থেকে আমি তাঁকে সদাসর্বদা দীনের সেবায় নিমগ্ন দেখেছি এবং কঠিন রোগাক্রান্তাবস্থায়ও রোগ-ব্যাধিকে গোপন করে, যাতে তাঁকে খেদমত থেকে রোধ না করে দেয়া হয় তিনি সর্বদা সেবায় নিয়োজিত থাকেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঐ সকল সাড়াদানকারীদের মধ্যে তাঁর সাড়া নিঃসন্দেহে নিষ্ঠাপূর্ণ ধ্বনি ছিল যা পরম সততার সাথে উত্থিত হয়েছিল। সুতরাং আজীবন পরবর্তিতে যা তিনি আমার সাথে অতিবাহিত করেন তা ছিল দীপ্ত নমুনাস্বরূপ যে, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র 'আনসার' বা সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

ঐ সকল লোকদের মধ্যে আরও বহুজন এরূপ আছেন যাঁরা তাদের নিয়্যতকে পুরা করে বাস্তবায়িত করেছেন। তাদের কতক তাদের নিয়্যত পুরো করে খোদার হুযূরে হাযির হয়ে গেছেন। আর কিছু সংখ্যক এমনও আছেন যারা অপেক্ষারত আছেন। আল্লাহতা'লা তাঁকে রহমতসিক্ত করুন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সেবায় আত্মনিয়োজিত অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রতি বছর জলসার পরে যখন আমি তাঁকে মোবারকবাদ জানাতাম যে, "আপনি অতি উত্তম খেদমত করেছেন, আল্লাহ্ ইহা কবুল করুন।" তখন তিনি সর্বদা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন এবং দু'টি কথা সর্বদা বলতেন। একটি তো এই যে, আমার খেদমত বলতে কিছুই নয়। এটা আপনার দোয়ার ফলবিশেষ আবার পুনরাবৃত্তি করে বলতেন যে, "আমি লৌকিকতাচ্ছলে বলছি না বরং অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, ইহা কেবল দোয়ারই ফল। আমি একেবারেই তুচ্ছ।" দ্বিতীয়তঃ এই দোয়ার কথা স্মরণ করাতেন যে, "আমার জন্যে সর্বদা দোয়া করবেন যে, চলে ফিরে শেষ নিঃশ্বাস অবধি খেদমতের মধ্যে যেন আমি প্রাণ বিসর্জন করি।" তদ্রূপই ঘটেছেও। এই জলসায় (ইংল্যাণ্ড সালানা জলসা '৯১ ইং—অনুবাদক) যা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আপনারা দেখেছেন যে, কিরূপ কঠিন রুগ্নাবস্থায়ও চলে ফিরে দীনের খেদমতের কাজে আত্মনিয়োজিত থাকার তিনি তৌফীক লাভ করেছেন। প্রত্যুষে যখন আমার বেগম জানতে পারলেন যে, বাঙভী সাহেব ইন্তেকাল করেছেন, তখন তিনি বল্‌লেন বহু রাত পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ নীচে থেকে আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তিনি বার বার এসে মেহমানদের নির্দেশাবলী দিচ্ছিলেন।" কেউ ভাবতেও পারত না যে, এতো তীব্র ও উঁচু কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি এইভাবে বহু রাত পর্যন্ত অতিথি-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি উষালগ্নে সহসা বিদায় হয়ে যাবেন। কিন্তু যা হোক ইহাও আল্লাহ্‌তা'লার অতি বড় 'ইহসান' যে, ১৯৮৫ইং হ'তে এ যাবৎ যখন থেকে আমি তাঁকে জলসার অফিসার ইনচার্জ নিযুক্ত করেছিলাম তিনি অতি উত্তমরূপে সাফল্যের সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং তার এই সবটা জীবনই Lease -এর উপর ছিল অর্থাৎ ডাক্তাররা তো জবাব দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু দীনে খেদমতের স্পৃহা তাঁকে বয়ে নিয়ে বেড়াতো এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর ঐ জয্‌বাকে কবুলও করেছেন, আর জীবনের এক নব স্তরও তাঁকে দান করেছেন।

অতএব, বিচ্ছেদ-বিরহ যদিও মানুষকে নিশ্চিত কষ্ট দেয়। কিন্তু কোন কোন বিদায়-বিরহ দুঃখের সাথে সাথে আনন্দের আবেগবহও হয়ে থাকে। তাঁর বিদায়ের স্বরূপটিও তদ্রূপই বটে। যেমন কোন সাফল্যময় সফর শেষে বিদায় গ্রহণ করছেন। তখন মানুষ তাঁকে অন্তরের গভীর বেদনার সাথে তাকে বিদায় দিয়ে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে আন্তরিকতা-পূর্ণ মোবারকবাদও পেশ করে। অতএব, আমি এই বিদায়ী ব্যক্তিকে অনুরূপ জয্‌বার সাথে এই বলে বিদায় জানাচ্ছি যে, "হে বিদায় গ্রহণকারী! আমরা অত্যন্ত হৃদয় ভারাক্রান্ত।

আমাদের হৃদয় তোমার মৃত্যুতে শোকাভিভূত। কিন্তু আমরা গভীর আন্তরিকতার সাথে তোমাকে মোবারকবাদ পেশ করছি। তুমি একজন সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তির জীবন অতিবাহিত করেছ এবং একজন সফল আহ্‌মদীসুলভ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস অবধি জীবিত থাক এবং সে অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন কর।'' আল্লাহ্‌তা'লা অগণিত রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর উপর এবং এই টিমকে অনুরূপ নেকীসমূহের উপর কায়েম রাখুন যে টিম তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং দোয়ার দ্বারা তৈরী করে গেছেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করুন, আমাদেরকে তাঁর উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন। তাঁর সন্তানদের তওফীক দিন যেন তাঁরা তাঁর সদগুণসমূহকে নিজেদের মধ্যে উজ্জীবিত করে সেগুলোকে নবজীবন দান করেন।

জামাত আহ্‌মদীয়ার যদ্দূর সম্পর্ক, তাদের ইতিহাসে তিনি চিরকাল জীবিত (চিরস্মরণীয় হয়ে) থাকবেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সর্বদা তাঁর ফযল ও অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী করে রাখুন এবং তাঁর আত্মাকে ''আ'লা-ইল্লিয়ূনে'' স্থান করে দিন।

অতঃপর আমি সংক্ষেপে ঘোষণা করতে চাই যে, জুমু'আর পরে পরেই ইনশাআল্লাহ্‌ মরহুমের জানাযার নামায হবে। সেই সঙ্গে কিছু সংখ্যক জানাযা গায়েবও হবে, যাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে। আমার খাহেশ ছিল যে, এই জলসার শেষে ইসলামাবাদেই তাঁর জানাযা হোক। সুতরাং এই খাহেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে অত্যন্ত ত্বরিৎ তাঁকে গোসল দিয়েছেন। অতএব, সকলে জুমু'আর পরে এখানেই দাঁড়াবেন, কয়েকজন সঙ্গীদের ব্যতীত যাঁরা আমাদের সাথে বাহিরে গিয়ে লাশের সামনে দাঁড়িয়ে নামাযে জানাযা আদায় করবেন। বাকি আপনারা অনুরূপ ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হলেন। (সাপ্তাহিক বদর ২৯শে অক্টোবর '৯১ইং)

জরুরী ঘোষণা

যারা কাদিয়ান যাবার জন্য টাকা জমা দিয়েছেন তাদের রিজার্ভেশনের জন্য নাম কলিকাতায় পাঠান হয়েছে। যাত্রীদেরকে অবশ্যই ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছতে হবে। ভিসার জন্য পাসপোর্ট নিয়ে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে দারুত তবলীগে হাজির হতে হবে। কমপক্ষে ২০ দিনের ভিসা নিতে হবে। প্রতি দিনের জন্য পাঁচ ডলার অর্থাৎ ১০০ ডলার পাস পোর্টে লিখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

খাকসার

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

জেহাদ বিল্ কুরআন

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

আহ্মদীয়াতের বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি ও প্রসার দেখে বৈরী বিরুদ্ধবাদীরা এই কথা বলে জী' এর জ্বালা মেটাতে চায় যে, মির্যা সাহেব ইংরেজের দালালী করেছেন, তাই বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ না করার পক্ষে ফত্ওয়া দিয়েছেন। এই অভিযোগ যে মিথ্যা, কল্পিত ও বানোয়াট তার প্রমাণ হচ্ছে :

(১) মির্যা সাহেব (আঃ) ইংরেজদের খোদার বেটা খোদার—স্বাভাবিক মৃত্যু ঘোষণা করে তাদের সেই খোদার বেটার কবর দেখিয়ে দিয়েছেন। অতএব, মির্যা সাহেবের চাইতে কোন বড় দুশমন ইংরেজদের আর জন্মে নি জন্মিবেও না।

(২) তিনি (আঃ) মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লিখেছিলেন :

"হে সম্মানিত মহারাণী! আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, তুমি আশীষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া সত্বেও ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারী।..... .....তুমি তওবা কর এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা এখতিয়ার কর যাঁর কোন পুত্র নেই এবং যাঁর বাদশাহীতে কারও অংশীদারিত্ব নেই।.....তোমার যদি কোন প্রকার সংশয় থাকে, তাহলে এসো, আমি তোমাকে তাঁর সত্যতার নিদর্শনাবলী দেখাতে প্রস্তুত আছি।".....হে মহারাণী! তুমি তওবা কর.....এবং তুমি ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যাদের উপরে খোদার রহমতের দৃষ্টি থাকে।" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)

পক্ষান্তরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে কবি আল্লামা ইকবাল যে শোক গাঁথা রচনা করে ছিলেন তাতে আছে :

میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لئے
اقبال اڑ کے خاک سر راہ گزار ہو

'সম্রাজ্ঞীর লাশ উঠেছে! সম্মান দেখানোর জন্য যে পথে লাশ যাবে সে পথে ধূলা হয়ে ইকবাল তুমি পড়ে থাক।.....'মহারাণীর মৃত্যুতে কবি লিখেছেন,

اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایۂ خدا

'হে হিন্দুস্থান! তোমার মাথার উপর থেকে খোদার ছায়া উঠে গেছে।.....ইত্যাদি। পাঠক, এখন চিন্তা করুন দালাল কে?

(৩) সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে তখন হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর বয়স ছিল ২২ বৎসর। সুতরাং তখন তাঁর পক্ষে জেহাদের বিরুদ্ধে ফত্ওয়া দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

(৪) মুসলিম লীগের পত্তন হয় ১৯০৬ সালে এবং হযরত মির্যা সাহেবের ওফাত হয় ১৯০৮ সালে। সুতরাং তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন বলে যে অভিযোগ তা ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষপ্রসূত।

(৫) সমসাময়িক গয়ের আহ্‌মদী আলেমদের অভিমত ছিল যে, হিন্দুস্থান 'দারুল হরব', ছিল না সুতরাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ শরীয়ত সম্মত ছিল না। মাওলানা নযীর আহমদ দেহলবী লিখেছেন :

"খোদার অশেষ মেহেরবানী যে, সময়ের প্রয়োজনে ইংরেজ বাদশাহ হয়েছেন।" (বক্তৃতাবলী) মৌঃ মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী লিখেছেন :

"এই শান্তি ও স্বাধীনতা এবং সুশাসনের দিক থেকে হিন্দুস্থানের আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায় বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে সৌভাগ্য মনে করে এবং এই সরকারের প্রজা হওয়াকে ইসলামী সুলতানদের প্রজা হওয়ার চাইতে উত্তম মনে করে।"

(এশায়াতুস্ সুন্নাহ : ১০ম সংখ্যা)।

বাটালবী সাহেব মনে করতেন যে, হযরত মির্যা সাহেব ছিলেন ইংরেজদের দুশমন। তাই তিনি ইংরেজ গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, "এই ব্যক্তির উপর ভরসা করা সরকারের উচিত নয় এবং তার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যথায়, এই কাদিয়ানী মাহ্‌দী দ্বারা এইরূপ ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা রয়েছে যেরূপ ক্ষতি সুদানী মাহ্‌দী দ্বারাও সাধিত হয় নি।" (প্রাগুক্ত, ১৬শ সংখ্যা)।

(৬) এ ইতিহাস সবারই জানা যে, প্রাক-ইংরেজ আমলে শিখরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ছিল। তারা আযান দিতে দিত না। মসজিদগুলো যবর দখল করে নিয়ে ছিল। মুসলিম নারীদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালাতো……ইত্যাদি। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে শিখদের এই সব বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে হিজরী তের শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ সাহেব বেরেলভী (রহঃ) জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিখদের বিরুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাকে শহীদ করেন বালাকোটে।

পাঞ্জাব ইংরেজদের শাসনাধীনে এলে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে। জান ও মালের নিরাপত্তা দান করে। ধর্ম পালনে ও প্রচারে অধিকার দান করে। অতএব, ইংরেজদের এইরূপ শাসন ও সুবিচারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পাঞ্জাবী মুসলমানদের উচিত ছিল। মানুষের সাধুতা ও ভদ্রতা এটাই দাবী করে যে, দুঃখের দিনের উপকারীর উপকার স্বীকার করা হোক, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক এবং এইরূপ সাধুতা ও সৌজন্য প্রকাশের জন্যই তৎকালীণ ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রশংসাসূচক কথা বলেছিলেন হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)। এ ছিল না কোন দালালী, না তোষামোদ। তাঁর নিজের কথায়—

অতএব, হে নির্বোধেরা শুন! আমি এই সরকারের কোন তোষামোদ করি না! বরং আসল কথা এই যে, এইরূপ সরকার, যারা দীন ইসলাম ও ধর্মীয় কার্যাদি পালনে কোন হস্তক্ষেপ করে না এবং তাদের নিজেদের ধর্মের উন্নতির জন্যও আমাদের উপর তরবারি চালায় না, কুরআন শরীফের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কেননা, তারাও কোন ধর্মযুদ্ধ করে না," (কিশ্‌তী-এ-নূহ)।

(৭) হিন্দুস্থান ও মক্কা মুয়াজ্জেমার তৎকালীণ প্রখ্যাত মুফ্‌তী বা আইনশাস্ত্র বিশারদগণের সিদ্ধান্ত ছিল:

'যতদিন ইসলামের নিজস্ব বিধি-বিধান কিছুটা চালু থাকবে ততদিন এ দেশ (হিন্দুস্থান) দারুল ইসলাম থাকবে।'

'এখানে খৃষ্টানরা মুসলমানদের রক্ষা কবচের ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং যেখানে মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে জেহাদ চলতে পারে না।.....এতদ্ব্যতীত এখানে মুসলমানদের বিজয় ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে জেহাদ এখানে আইন সিদ্ধ নয়। .....(দ্রঃ ডব্লিউ হাণ্টার: দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্‌)

(৮) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে কর্তব্য মনে করেন নি। তাই তিনি সেই জেহাদ করেন নি এবং তাঁর অনুসারীদেরকে করতে বলেন নি। সে সময়ে তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও ছিল অল্প, মাত্র ৪/৫ লক্ষ। কিন্তু, সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি মুসলমানের যে সকল ধর্মীয় নেতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয মনে করতেন, তাঁরা সেই জেহাদ করে ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন নি কেন? যে কাজটা তারা ফয়য জেনেও করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কাজটা যিনি ফরয মনে করেন নি, তাঁর উপরেই চাপাবার কারণ কি? এটা কি 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাবার চেষ্টা নয়?

(৯) ইংরেজরা তো অস্ত্রের মুখে এদেশ ছেড়ে চলে যায় নি, গেছে শাসনতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের মুখে। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে তো কংগ্রেসের গোঁড়ামী ও চালাকীর দরুণ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মিঃ জিন্নাহ্‌ দেশ ছেড়ে, রাজনীতি ছেড়ে লণ্ডনে গিয়ে ওকালতী জীবন শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে মুসলমানরা নেতা হারা ও দিশেহারা অবস্থায় নিমজ্জিত হচ্ছিল। তখন মুসলিম লীগকে পুনর্গঠিত করে এবং বুঝিয়ে-সমঝায়ে জিন্নাহ সাহেবকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনরায় রাজনীতিতে নামিয়ে ছিলেন যিনি তিনি তো হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এরই পুত্র এবং তাঁর দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ).....মৌলানা মওদুদী সাহেব হয়ত মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের দিকে খেয়াল করে বলেছেন যে, ইসলামের বিজয়ে তরবারির ভূমিকা রয়েছে। এবং তাঁর মতই তাঁর অনুসারীরা এখনও অনুরূপ বিশ্বাসই পোষণ করেছেন। কিন্তু তারা কি একবারও ভেবে

দেখেছেন যে, স্পেনে এখন মুসলমান নেই কেন? শত শত বৎসর ধরে শাসন করার পরও সে দেশ কী করে মুসলমান শূন্য হয়েছিল? পক্ষান্তরে মূসা তারিকের মত কোন্ সে জেনারেল এসেছিলেন বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তরবারি হাতে ইসলাম প্রচার করতে? এ অঞ্চলে তো মুসলমান আছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আছে। এবং এ অঞ্চলে ইসলাম এনেছিলেন মুসলিম ওলী দরবেশরা (রহঃ)। তাই, এসব দেশে মুসলমান আছে, থাকবেও খোদার ফযলে। অথচ, স্পেনে মুসলমান বিতাড়িত হয়েছে তরবারি দ্বারা। তরবারির দ্বারা যার প্রসার ঘটে তরবারি দ্বারাই তার বিলোপ ঘটা সম্ভব। এই সত্যটা সবার মনে রাখা প্রয়োজন।

ইসলামের প্রধান প্রধান মহাপুরুষরা (রাঃ) কোন্ তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। কোন্ তরবারির দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর হৃদয়ের সকল আবরণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন? কোন্ সে তরবারি ছিল যার ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করে রসূল পাকের চরণ তলে লুটিয়ে পড়েছিলেন? বলবেন কি মৌদুদী সাহেবরা? বলবেন কি আজকের জেহাদী আলেমরা — কোন্ সে তরবারী ছিল যার আঘাতের ভয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন—হযরত উসমান, হযরত আলী প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ইসলামের প্রথম পর্যায়ের খলীফাগণ—যে খালেদ কোন দিনই কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নি, মহাবীর সেই খালেদ সাইফুল্লাহ্‌র হৃদয়ের কালিমা কোন সে সাইফের ভয়ে দূরীভূত হয়েছিল আপনা আপনি? বলবেন কি মৌদুদী সাহেব? হায়রে! পার্থিব ক্ষমতার লালসা? এই সব তথাকথিত জেহাদীর জন্য আফসোস এই যে, এরা কখনই জেহাদ করে কোন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করবে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চাইলেও তাদেরকে অস্ত্রের পরিবর্তে কুরআনের দ্বারা জিহাদ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রচারের জন্য কলমের জিহাদ করতে হবে। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করার জনা আত্মশুদ্ধির জেহাদ করতে হবে। এবং এ সবই হচ্ছে—জেহাদে কবীর বা বড় জেহাদ। খোদার অশেষ ফযল ও রহমে এই বড় জেহাদই এই যুগে চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামা'ত —'আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত'—সারা বিশ্ব জুড়ে যারা জান-মাল, ওয়াক্ত-ইজ্জত কুরবানী করে। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী ও মসীহ্‌কে (আঃ) উপাধি দিয়েছেন 'সুলতানুল কলম' এবং তাঁর কলমের নাম দিয়েছেন 'জুল্ ফিকারে আলী'। সুতরাং এই সেই 'জুল্ ফিকার' যার শানিত ও অব্যর্থ আঘাতে পরাভূত হচ্ছে বর্তমান যামানার সকল তাগুতী শক্তি। আল্লাহ্ পাক সবাইকে এই জেহাদে কবীরে অংশগ্রহণ করার তৌফীক দান করুন। (আমীন)।

'ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।'

সত্যবাকের মিথ্যা ভাষণ

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

মৌলানা মৌদুদী পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে ছিলেন! ফলে পাকিস্তানীরা তাকে শত্রু বলেই মনে করত। তিনি পাঠানকোট থেকে লাহোর গিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত জামা'তে ইসলামীকে পাকিস্তানের পরিবেশে নূতন করে পুনর্গঠন করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তার যেসব বইতে পাকিস্তান, মুসলিম লীগ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্বন্ধে আপত্তিকর উক্তি ছিল নূতন সংস্করণে যে সব উক্তি বাদ দেয়া হল। অবশ্য ভূকিকায় বলা হয় যে, পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন ছাড়াই বইগুলি পুনঃ মুদ্রিত হল (নমুনা স্বরূপ দেখুন, সিয়াসিকসমকস, ৭ম সংস্করণ ও পূর্বে প্রকাশিত ৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)। ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সংগঠনটি মিথ্যা বলাকে অন্যায় বলে মনে করে না। কারণ মৌলানা মৌদুদী লিখে গিয়েছেন যে, প্রয়োজনে মিথ্যা বলা শুধু জায়েযই নয় বরং অবশ্য কর্তব্য (তরজুমানুল কুরআন, মে ১৮৫৯)। পাকিস্তান বিরোধিতার কারণে মৌদুদী সাহেব এসব পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন এবং মিথ্যা বলেও পাকিস্তানী জনগণের আস্থা লাভ করতে সক্ষম হলেন না। তাই তিনি বেছে নিলেন অন্য একটি পথ। যে পথে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে উত্তেজিত করে তিনি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে নিলেন। সেই পথটি হল আহ্মদী মুসলিম জামা তের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেয়া। তিনি 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে বই লিখলেন, পত্র পত্রিকায় সত্য মিথ্যা মিলিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

শুরু হল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। প্রথম বারের মত পাকিস্তানের যমীনে এল মার্শাল ল'। অগণিত মানুষের জীবন নাশের কারণে মৌদুদীর ফাঁসীর হুকুম হল। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে তিনি শাস্তি পেয়েও মুক্তি পেলেন। এ ব্যাপারে জাষ্টিস কায়াসী ও জাষ্টিস মুনীরের তদন্ত আদালতের রিপোর্ট দেখুন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা কারো অজানা নয়। লক্ষ লক্ষ নর নারী এদের যুব-সংগঠন আল বদরের হাতে নিহত হয়েছে। জামাত পন্থীদের হাতে নারী নির্যাতনের কাহিনী ছবি সহ তৎকালীণ উর্দু পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। একাত্তোরের ঐ দিনগুলোর কথা আজো এদেশের সচেতন নাগরিকরা ভুলে যায় নি। তাই তারা এদেশের বুদ্ধিজীবী ছাত্র জনতার কাছে এখনও ধিকৃত। যেহেতু এদেশের মানুষ মৌদুদী সাহেবকে গ্রহণ করতে পারছেন না তার আকিদা ও ক্রিয়া কর্মের জন্য, তাই জামা'তে ইসলামী বাংলাদেশের পাকিস্তানী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ঘোষণা দিলেন, মৌলানা মৌদুদীকে আমি নির্ভুল মনে করি না (ইকামাতে দীন, ৭৪ পৃঃ)। অবশ্য মৌদুদীকে ভুল বললেও ওরা একাত্তোরে যা করেছে তাকে ভুল বলে নি (বিচিত্রা, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮৮ এবং ১৪ই বৈশাখ, ১৩৯১)।

এদেশের সচেতন জনগণ জামা'তে ইসলামীর কীর্তিকলাপ ভুলেন নি। তাই তারা এখন সেই পুরাতন পন্থাকে বেছে নিয়েছে। যে পদ্ধতিতে তারা পাকিস্তানে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেছে সেই একই পদ্ধতি তারা বাংলাদেশেও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আহ্‌মদী মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি করে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে শান্তি প্রিয় জনগণকে উত্তেজিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা চায় এদেশের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশকে বিনষ্ট করে ঘোলা পানিতে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করা। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমানদের সকল ফির্কার লোকদের (জামা'তে ইসলামী ছাড়া) রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। পাকিস্তানের মত এদেশ শুধুমাত্র মুসলমানের নয়; বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আহ্‌মদী মুসলিমরাও জীবন দিয়েছে আল বদর রাজাকারের হাতে। বাবরি মসজিদ নিয়ে বি, জে, পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মসূচীর কারণে যখন এদেশের পরিবেশও উত্তপ্ত তখন সাম্প্রদায়িক শক্তি একটা অঘটন ঘটাবার প্রচেষ্টায় ১লা নভেম্বর শুক্রবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ঐ দিন চকবাজার মসজিদে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে শান্ত করতে হয়। পুলিশ মোতায়েন করতে হয় বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মশালাতে। তা সত্বেও ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় পুলিশের সাথে উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষ হয় (আজকের কাগজ: ২রা নভেম্বর, '৯১)।

এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য আহ্‌মদীয়া যুব সংগঠন বকশী বাজারে একটি ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করে। শান্তি, মৈত্রী এবং ভালবাসার বাণী উদ্ধৃত করে বিভিন্ন ধর্মের সম্মানীত বক্তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে বক্তব্য পেশ করেন। মহান ইসলামের শান্তি ও মৈত্রীর অমূল্য শিক্ষাকেও উপস্থাপন করা হয়। বলা হয়, ইসলাম যুদ্ধের সময়ও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মস্থান, পুরোহিত, ফলদার বৃক্ষ ইত্যাদি হত্যা বা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে (মোয়াত্তা)। অতএব, কোন প্রকৃত মুসলিমের পক্ষে মন্দির ভাঙ্গা সম্ভব নয়। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়া ইসলামে নিষিদ্ধ। শান্তি ও সম্প্রীতির এই প্রয়াসকে এদেশের পত্র-পত্রিকয় ছবি সহ প্রচার করে। ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে।

জামা'তে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ১১ই নভেম্বর সংখ্যায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের এই মহতী প্রয়াসকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে। আমরা অতি সংক্ষেপে ক্রমিক নম্বর দিয়ে তথাকথিত 'সত্যবাকের' অভিযোগ গুলির জবাব জনসমক্ষে পেশ করছি:

(এক) আহ্‌মদীয়া বা কাদিয়ানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে দাবী করে। পাকিস্তান ও উগাণ্ডায় এদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে। রাবেতা আলমে ইসলামীও দুশমন আখ্যা দিয়েছে।

—আহ্‌মদীরা নিজেদেরকে কাদিয়ানী বলে না। কাদিয়ানী বলে কোন ধর্মীয় দল পৃথিবীতে নেই। কাদিয়ান নামক স্থানে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা কাদিয়ানী।

আহ্‌মদীরা আল্লাহ্‌র একত্বে, সকল নবী, সকল ঐশী গ্রন্থ, ফিরিশ্‌তা, পরকাল, তকদীর ইত্যাদিতে ঈমান রাখে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে, কুরআনী শরীয়ত অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত পালন করে। ইসলামের অপর ৭২টি ফির্কা থেকে পৃথক দেখাবার জন্য তারা নিজেদেরকে আহ্‌মদী মুসলিম বলে। তারা কোন উম্মতির নামে (যেমন মালেকী, শাফেয়ী ইত্যাদি) নিজেদের পরিচয় দেয় না। মহানবীর (সাঃ) দ্বিতীয় নাম আহমদ নামে তারা নিজেদেরকে আখ্যা দিয়ে থাকে। 'সত্য' 'বাক' লিখেছেন, আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজের নামে এই জামাতের নাম রাখেন 'আহ্‌মদী' (২য় কলাম)। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই ঘোষণা দিয়ে গেছেন, এই সম্প্রদায়ের নাম আহ্‌মদী মুসলিম সম্প্রদায় রাখার কারণ, আমাদের নবীর (সাঃ) দু'টি নাম, এক: মুহাম্মদ (সাঃ) দুই: আহ্‌মদ (সাঃ).....সুতরাং এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম আহ্‌মদীয়া রাখা সমীচীন মনে করা হয়েছে (ইস্তেহার: ৪ঠা মার্চ, ১৯০০ইং)।

পাকিস্তানের ভুট্টো সরকার এবং পরে জিয়াউল হক সরকার এই জামাতকে রাজনৈতিক ভাবে 'নট মুসলিম' ঘোষণা করে। ভুট্টো ও জিয়াউল হকের পরিণতি সমগ্র জগদ্বাসী জানে। মৌলানা মৌদুদী বলেছেন, ভুট্টো আইনের বারটা বাজিয়ে গেছেন (বিকালের আসর, ১১৭ পৃঃ) আইনের যে বারটা বাজায় তার আইনে আহ্‌মদীরা কি করে 'নট মুসলিম' হয়? কোন সংসদ কাউকে মুসলিম বললে সে মুসলমান হবে এবং কাউকে অমুসলিম বললে সে অমুসলমান হয়ে যাবে এ কথা কুরআন সমর্থন করে না। যারা কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে এহেন নব বিধান আবিষ্কার করে তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাই শাস্তি দিয়ে থাকেন। উগাণ্ডার ইদিআমীন পাকিস্তানের দেখা দেখি আহ্‌মদী জামা'তের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। ইদিআমীনের পাগলামী জগৎ বিখ্যাত। নেংটা হয়ে ছবি উঠিয়ে পত্র-পত্রিকায় ছেপেছে! বর্তমানে ইদিআমীন কোথায় বলতে পারেন কি? ইদিআমীন নিজের কৃত কার্যের ফল ভোগ করেছেন। আজ ইদিআমীন নেই উগাণ্ডায়, তৎসঙ্গে তার রচিত আইনও নেই সেখানে।

রাবেতা সৌদী রাজতন্ত্রের ছত্র ছায়ায় গঠিত একটি সংস্থা। সৌদী নীতি ও আদর্শকে জগতে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করাই এর উদ্দেশ্য। রাজতন্ত্র কখনও খিলাফতকে বরদাস্ত করতে পারে না। আহ্‌মদীরা খিলাফতে বিশ্বাসী। তাই সৌদী রাজ আহ্‌মদীদের বিরোধী। মক্কা ঘোষণায় কুরআনের অর্থ বিকৃত করে ওরা খেলাফতের অর্থ করেছে 'সফলতা' (মক্কা ঘোষণা, ১৪ পৃঃ রাজকীয় সৌদী দূতাবাস থেকে প্রকাশিত)। অতএব, রাবেতা যদি খিলাফত বিশ্বাসী রাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী আহ্‌মদীদেরকে শত্রু জ্ঞান করে তাহলে আশ্চর্যের কি আছে? মৌদুদী সাহেব এক কালে এদেরকে বেনারস ও হরিদ্বারের পণ্ডিত পুরোহিত আখ্যা দিয়ে ছিলেন (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ৪৩ পৃঃ)। তিনি আরো বলেছেন, "শুধু কা'বা গৃহের রক্ষক আর ব্যবস্থাপক হলেই কেউ বৈধ মুতাওয়াল্লী হয়ে যায় না (তফহিম: ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ)।

(দুই) ১৯০৮ সালে তিনি নবী ও রসূল হওয়ার দাবী করেন, একথা ঠিক নয়। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইলহামে এই শব্দ দু'টি ছিল। নবী বলা হয়—যে গায়েবের সংবাদ পায়। আর রসূল বলা হয় যে কোন প্রেরিতকে। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যেহেতু গায়েব থেকে সংবাদ পেয়ে জানবেন যে, তিনি মাহ্‌দী এবং যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃকই প্রেরিত হবেন অতএব, তিনি আরবী ভাষা অনুযায়ী নবী ও রসূল। তবে আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, শুধু নবী রূপে এখন আর কেহ অবতীর্ণ হবে না। উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নূতন বা পুরাতন কোন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবীর আবির্ভাব হবে না। তবে উম্মতি নবীর আবির্ভাব হবে। আর সেই পদ মর্যাদা হল ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহের (দেখুন এক গলতি কা ইযালা প্রভৃতি পুস্তক)। মৌলানা থানবী তাঁর নসরুত্তিব কিতাবে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নবী উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে জন্ম নিবে (যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, ২৪০ পৃঃ)। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বহু বুযুর্গও এই মতে বিশ্বাসী (দেখুন ফতুহাতে মক্কিয়া, আল ইওয়াকিতুল জওয়াহের, আল ইনসানুল কামেল, তফহিমাতে এলাহিয়া, মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ইকতরাবুস সায়াত, দাফেউল ওয়াস, তাহাযিরুন নাস প্রভৃতি) 'সত্যবাক' এর নেতা মৌদুদী সাহেব লিখেছেন, "তিনি যখন নাযিল হবেন, তখন হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) শরীয়তের অনুসারী হিসাবে নাযিল হবেন যেন তিনি তাঁর উম্মতেরই একজন (তফহিমুল কুরআন ১২শ খণ্ড, ১৫২ পৃঃ)। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, "দুনিয়ায় যে রসূলই এসেছেন তিনি সহসা আকাশ থেকে নেমে আসেন নি (ঐ, ১১৫ পৃঃ) মৌদুদী সাহেবের মতে দূত, বাণী বাহক, সংবাদদাতা সবাই রসূল (তফহিমুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ২৬ পৃঃ) ঈসার (আঃ) হাওয়ারীরাও রসূল (ঐ, ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ)।

যেখানে ঈসার (আঃ) সাহাবীদেরকে রসূল বলে স্বীকার করেন, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ইমামুল্‌মুরসালীন রহমতুল্লিল আলামীন, খাতামান্নাবীঈনের (সাঃ) উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় এই খেতাব দিলে চীৎকার করেন কেন? বড় নবীর উম্মতও বড়, শ্রেষ্ঠ নবীর গোলামও শ্রেষ্ঠ। এটাই আহ্‌মদীয়াতের বিশ্বাস।

(তিন) আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জীবদ্দশায় ঘোষণা দেন যে, কে আছ? যে আমার জীবনীতে কোন দোষ বাহির করিতে পার? হ্যাঁ, তিনি এই ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। সত্য বাক ফত্‌ওয়া গ্রহণকারী যে মৌলানা মুহাম্মদ হুসেনের (২ কলাম, প্রথম ছত্র) সার্টিফিকেট দিয়ে কথা বলেছেন সেই ব্যক্তিটি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন যে, বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন ও অবস্থা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, সম সাময়িক লোকের মধ্যে খুব অল্প লোকই তাহা জানেন। মির্যা সাহেব এবং আমি একই অঞ্চলের অধিবাসীরা।.....ইসলামের সেবায় ব্যক্তি-

গত ও আর্থিক ত্যাগের এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিক দিয়া লেখনি ও বক্তৃতায় এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, ইহার তুলনা পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে অতি বিরল·····বরাহীনে আহ্‌মীয়ার প্রণেতা বিরুদ্ধবাদী এবং সমর্থনকারী উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা এবং জানামতে মুহাম্মদীয়া শরীয়াতের প্রতিস্থ এবং পরহেযগার মুত্তাকী (ইশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ ও নবম সংখ্যা 'সত্যবাক' যেখান থেকে তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈনের উদ্ধৃতিটি নকল করেছেন সেখানে এই কথাগুলিও ছিল কিন্তু তিনি পাঠককে ফাঁকি দেবার ইচ্ছায় ঐ কথাগুলি গোপন করে গেছেন।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ঘুষ খেতেন, ঐ টাকা দিয়ে অলংকার তৈরী করতেন, পতিতার চাঁদা গ্রহণ করতেন, মদ খোর, আফিম খোর, চরিত্রহীন ছিলেন, নামাহরেম মহিলা দিয়ে পা টিপাইতেন, (নাউযুবিল্লাহ, লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন) এসব কথা লেখক এবং তার মত 'মিথ্যাবাক' দের রচনা। বিশ্বনবীর (সাঃ) চরিত্রেও খৃষ্টান পাদ্রীরা এবং সালমান রুশদীর মত লোকেরা এহেন অপবাদ রটনা করেছে। রঙ্গিলা রসূলের লেখকও এইসব অপবাদকারীদের মত এক জঘন্য ব্যক্তি ছিল। 'সত্যবাক' এর 'মিথ্যাবাক' শুনে হতবাক হতে হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সত্য মিথ্যা যাচাই না করে যে অপরের প্রচারিত কথা প্রচার করতে শুরু করে সে মিথ্যাবাদী (হাদীস)

মৌদুদী সাহেবের একটা উপদেশ লেখকের জন্য পেশ করছি, "যে ব্যক্তি নবুওয়ত লাভের পূর্বে একটি সমাজে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, সমাজের লোকেরা তাঁহাকে সব ব্যাপারে সৎ ও সত্যবাদী রূপেই পাইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি সহসাই খোদা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলিতে শুরু করিবে—আল্লাহ্ তাঁহাকে নবী ও রসূল না বানাইয়া থাকিলেও খোদা তাঁহাকে নবী ও রসূল বানাইয়াছেন বলিয়া সে দাবী করিবে, কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই এইরূপ ধারণা করিতে পারে না (তফহিমুল, ১০ম খণ্ড, ১২৫ পৃঃ)। লেখক এবং পাঠককে এই কথাটি এবং মৌঃ মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর বক্তব্যটি পাঠ করে চিন্তা করবার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাই। নামাহরেম স্ত্রী লোক দিয়ে পা দাবান জায়েয এ ফতওয়া আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নয়। বরং এসব ফতোয়া আপনাদেরই (দেখুন, ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ)। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম মহিলারা নবী করীমের (সাঃ) যুগে যুদ্ধে আহত পুরুষদের সেবা করতেন! সেবার বেলায় মাহরেম নামাহরেম কোন ভেদ ছিল না।

(চার) ২০০ আলেম মির্যা সাহেবকে এক বাক্যে কাফের ফতওয়া দেন। এর উত্তরে জানাচ্ছি যে, দলীল যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে ফতওয়াই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন দল নেই যার বিরুদ্ধে অপর দল ফতওয়া না দিয়েছে। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে সাত শত আলেম কুফরী ফতওয়া প্রদান করেছে (দেখুন মাওলানা

হুসেন আহমদ মদনীর ফতওয়া, হেজবুল্লা দারুত তসনীফ থেকে প্রকাশিত ফতওয়া, মৌলানা মাহদী হাসান, মুফতী দেওবন্দ, মৌলানা আব্দুল্লাহ মুফতী, মুলতান, মৌলানা এহতেশামুল হক থানবী, আরাকীনে লাজনাতুল কাজা ওয়াল এফতা ও আরো দুই হাজার আলেমের ফতোয়া, মৌদুদী জামাতের স্বরূপ পুস্তক)। ৪৫৩ জন আলেমের ফতওয়া দেখুন, বিচিত্রা ১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮ই মে, ১৯৮৪। এসব ফতওয়ায় আছে, এদের পেছনে নামায পড়া নাজায়েয এবং এদের বই পড়া নিষিদ্ধ।

মৌলানা মৌদুদী স্বীকার করেছেন, "একদলের মুসলমান অন্য দলের মুসলমানকে ঠিক ততখানিই শত্রু বলিয়া মনে করেন, যতখানি এক ইহুদী একজন খৃষ্টানকে শত্রু বলিয়া মনে করে, বরং তাহা হইতেও অধিক (বুনিয়াদী শিক্ষা, ৪৭ পৃঃ)।

মনে রাখবেন ফতওয়া বা পরিষদ দ্বারা কারো ঈমান বিচার করা যায় না। ঈমানের খবর একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন। তাই পবিত্র কুরআন কাফের মুমেনের বিচার একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে বলেই ঘোষণা দিয়েছে। কাউকে এ বিষয়ে ইজারা পত্তন দেয় নাই।

(পাঁচ) 'সত্যবাক' লিখেছেন হযরত মির্যা সাহেবের দাবী, 'হাম রসূল আওর নবী হ্যায়।' আবার ঐখানেই (২য় কলাম) লিখছেন যে, মির্যা সাহেব বলেছেন, ম্যায় খোদ খোদা হুঁ।' উর্দু উচ্চারণে লেখার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তিনি 'কাশফ' শব্দের ভুল অর্থ করেছেন, 'ভাবের উন্মেষ'। অথচ কাশফ্‌ অর্থ হল, জাগ্রত স্বপ্ন। স্বপ্ন ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থায়ই হোক স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্নকে ব্যাখ্যা বা তাবির করে গ্রহণ করতে হয়। বাজারে অসংখ্য তাবির সম্বন্ধে গ্রন্থ দেখেন নি? স্বপ্ন বাস্তব এবং আক্ষরিক হলে এত সব ব্যাখ্যার বই কেন? কুরআনেও স্বপ্নের তাবিরেরই উল্লেখ আছে। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্ন কি আক্ষরিক ভাবে পূর্ণ হয়েছিল? মিশর রাজের স্বপ্নের কি তাবির করেননি ইউসুফ (আঃ)? শুনুন, যাঁর এই স্বপ্ন বা রুইয়া তিনি এর তাবির করেছেন এই ভাবে, "আমি এই স্বপ্ন দ্বারা .....এই অর্থ করি না যে; আমিই খোদা।.....আমার উপরোক্ত স্বপ্নের অর্থ বুখারী শরীফে বর্ণিত নফল নামাযের বরকত সম্বন্ধীয় হাদীসের ন্যায়।" এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা বেশী বেশী নফল নামায পড়বে আল্লাহ্‌ তাদের হাত, পা, চোখ, হয়ে যান। প্রখ্যাত গ্রন্থ 'তাতিরুল আনাম ফি তা'বিরীল মানা'ম' এ বলা হয়েছে, "কোন ব্যাক্তি যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে খোদা হয়ে গিয়েছে, তাহলে এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্‌, তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন (৯ পৃঃ)।

আপনি নিজেই বলুন, যিনি নবী বা রসূল হওয়ার দাবীদার তিনি কি আবার খোদা হওয়ার দাবী করতে পারেন? নবী এবং রসূল হওয়ার দাবী অর্থই আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত। হযরত মির্যা সাহেবের রুইয়া দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন (দেখুন, তা'তিরুল আনা'মের তা'বীর)। আর সঠিক পথ প্রাপ্ত ব্যক্তিকেই মাহ্‌দী বলা হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) যে কস্তুর নিক্ষেপ

করেছিলেন তা যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিক্ষেপ করেছিলেন। মহানবীর (সাঃ)- হাতে হাত দেবার অর্থ আল্লাহ্‌র হাতে হাত দেওয়া। অস্বীকার করতে পারবেন কি?

(ছয়) আদম, মূসা, ইব্রাহীম, কৃষ্ণ, ইয়াকুব প্রভৃতি হওয়ার দাবী। হ্যা, ইমাম মাহ্‌দী বিভিন্ন নবীদের গুণে গুণান্বিত হয়েই আগমন করেছেন। তাঁর এই দাবী হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলবেন, "যারা আদম, শিস, নূহ, শাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ইউসা, ঈসা, শামউন এবং মোহাম্মদকে (সাঃ) এবং আলীকে এবং হোসেনের আওলাদকে দেখতে চায় তারা যেন আমাকে দেখে নেয় (বিহারুল আনওয়ার জিল্‌দ-১৩ পৃঃ ২০২)।

বাকী থাকল কৃষ্ণের কথা। জামাতে ইসলামী কৃষ্ণকে নবীরূপে মেনে নিয়েছে (মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮) অতএব যিনি নবীদের গুণে গুণান্বিত হয়ে জারিআল্লাহ ফি হুলুলিল আম্বিয়া রূপে আগমন করেছেন তিনি যদি আরব, পারশ্য, ভারত সহ সকল দেশের নবীদের মসীল হয়ে থাকেন তাহলে আপত্তির কি আছে? পবিত্র কুরআন বলে সকল জাতিতেই নবীর আবির্ভাব হয়েছে (ইউনুস, ৪৮ আয়াত)। আর এজন্যই জামাতে ইসলামীর পত্রিকা 'পৃথিবী' ন্যায্যভাবেই ভারতীয় নবী কৃষ্ণকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

(সাত) মির্যা সাহেব "পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে বিকৃতি ঘটাইয়া নিজের ইচ্ছামত শব্দাবলী সংযোজন করিয়াছেন।" 'সত্য বাক' সাহেব! আসুন ফয়সালা হয়ে যাক! আপনি ঐ ধরণের একটি কুরআন শরীফ জনসমক্ষে পেশ করুন, যাতে শব্দাবলী ইচ্ছামত সংযোজন করা হয়েছে! আসুন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।

এ দেশের আলীম সমাজ মৌদুদী সাহেবের অনূদিত এবং গোলাম আযমের দ্বারা পরিবর্তিত কুরআনকে বিকৃত আখ্যা দিয়ে তা বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন ইত্তেফাক, ৭/১/৮৩)। মৌদুদী সাহেব স্বয়ং বলেছেন, "কুরআনের নির্দেশমূলক এমন একটি আয়াতও সম্ভবতঃ পাওয়া যাইবে না—যাহার ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পূর্ণরূপে সর্বসম্মত (তফহিম ১ম খণ্ড, ২৬ পৃঃ)। অতএব, আমাদের তফসীর আপনাদের মনোমত না হলে বলার কি আছে? প্লীজ, মৌদুদী ভক্ত সাজার আগে তার বাণীগুলি একবার ভাল করে পাঠ করে নিন।

(আট) মক্কা ও মদিনার দুধ শুকিয়ে গেছে। আর কাদিয়ানের দুধ তাজা আছে। বলি, আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এহেন কথা তাঁর কোন্‌ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন বলতে পারবেন কি? না, শত চেষ্টা করেও বলতে পারবে না। বলি, মক্কা মদীনার দুধ বলতে আপনি কি বুঝেছেন? কোন শহর বা গ্রাম কি গাভীর মত দুধ দেয়? মহানবীকে (সাঃ) মিরাজ কালে দুধ, পানি এবং মধুর পেয়ালা পান করিতে দেয়া হয়েছিল (ইবনে জরীর)। তিনি দুধের পেয়ালা পান করেছিলেন। এর অর্থ মধ্যম পন্থা। আধ্যাত্মিক ভাষায় দুধ অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝায়। বর্তমানে মক্কা মদিনায় ইসলামী খিলাফত নেই। ঐ দু'টি পবিত্র শহর এখন

এমন এক রাজার অধীন যার চারিত্রিক বর্ণনা দেখতে পাবেন দি টাইম, ৩১/১০/৭৪, ২৪/৯/৯০ দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/৪/৯০ প্রভৃতিতে। অতএব, ওখানে তত্ত্বজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিবে কে? ইমাম মাহদী (আঃ) নূতন করে সেই ঐশী জ্ঞানের 'দুধ' জগদ্বাসীকে সরবরাহ করেছেন।

(নয়) মির্যা সাহেব রমযানের রোযা রাখতেন না, যাকাত দিতেন না। কথায় বলে কানা ছেলের নাম পদ্ম লোচন। ঠিক তেমনি 'সত্য বাক' নাম রাখা হয়েছে এমন এক ব্যক্তির যিনি অনর্গল মিথ্যার পর মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। আর এজন্য তিনি মোটেও লজ্জিত নন। আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এক বার লাগাতারভাবে ছয় মাস রোযা রেখেছিলেন। যিনি ছয় মাস নফল রোযা রাখতেন তিনি রমযানে ফরয রোযা রাখতেন না এমন কথা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। ইসলাম রোগীর জন্য রোযার অবকাশ দিয়েছে এবং অন্য সময়ে পুরা করতে বলেছে (বাকারা ২৩ রুকূ দ্রষ্টব্য)। আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সফরে এবং পীড়িত অবস্থায় কুরআনের বিধান অনুযায়ী রোযা ছেড়েছেন, অন্যথায় কোন সময়ে তিনি রোযা পরিত্যাগ করেন নাই। এমনকি তিনি বহু নফল রোযা রেখেছেন। মালদার নাহলে যাকাত ফরয হয় না। হযরত মির্যা সাহেব নেসাব ব্যক্তি ছিলেন না। উল্লেখ্য যে, নবী আকরামও (সাঃ) জীবনে কখনও যাকাত প্রদান করেন নি।

(দশ) আহমদীয়াদের সবচাইতে বড় কেন্দ্র ইহুদীদের রাষ্ট্র ইস্রাঈলে।

চমৎকার আবিষ্কার! এহেন 'গুল' যারা মারতে পারে তাদের সম্বন্ধে কি বলি, এসব তথ্য কোথায় পেলেন? আর এও জিজ্ঞেস করি, ইহুদীদের দেশে, ইহুদীদের কাছে ইসলাম প্রচার কি অন্যায়? আরবী পত্রিকা 'আল বুশরা'তে কি প্রচার করা হয় বলুন তো? বলেছেন, পত্রিকাটি ত্রিশটি আরব দেশে প্রচারিত হয়। যদি এই পত্রিকায় ইসলাম বিরোধী কিছু থেকে থাকে তাহলে ত্রিশটি আরব রাষ্ট্র তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না কেন?

(এগার) "রাবিতায়ে আলম আল ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ কিছু দিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করিয়া এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও কাদিয়ানীরা বেশ তৎপর।"

আলহামদুলিল্লাহ! নাস্তিকের দেশে আহমদীরা কুরআন প্রচার করছে এ খবর রাবেতার জেনারেল সেক্রেটারীর মুখে শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যারা নাস্তিকদের মধ্যে খোদার বাণী প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন আপনারা! আফসোস, শত আফসোস! 'সত্য বাক' সাহেব পঙ্কিল রাজনীতি ছেড়ে আপনারাও যান না একবার ইহুদী এবং নাস্তিকদের কাছে ইসলাম নিয়ে, কুরআন নিয়ে!

(বার) বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের আমীরকে 'ন্যাশনাল' আমীর বলায় লেখক ভয়ানক রাগ করে প্রশ্ন করেছেন, এই অধিকার তাহাদের কে দিল?

আশ্চর্য! তারা যখন কাউকে আমীর পদ দান করেন তখন অধিকারের প্রশ্ন উঠে না। প্রশ্ন উঠে অপরের বেলায়। জিজ্ঞেস করি, আমীর পদটি কি আপনাদের একচেটিয়া সম্পত্তি? খোলাফায়ে রাশেদীন আমীর নিযুক্ত করতেন। অন্য কেউ আমীর বানাবার অধিকারী নয়। আমাদের আমীর নিযুক্ত করেন সেই সুন্নত অনুযায়ী আহ্‌মদী জামা'তের বিশ্বনেতা খলীফা। জিজ্ঞেস করি আপনি কি এখনও বাংলাদেশকে একটি ন্যাশন বলে স্বীকার করেন না? ন্যাশনাল আমীর বলতে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীরকে বুঝি।

(তের) জিজ্ঞেস করেছেন, সম্মেলনে ৭শত প্রতিনিধির মধ্যে কোন্ কোন্ ধর্মের লোক ছিল?

উত্তরে জানাচ্ছি যে, হিন্দু, মুসলমান (আহ্‌মদী ও অ-আহমদী) বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক ছিল। বহু গণ্যমান্য শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, বিচারক, সাংবাদিক, চাকুরীজীবী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা সহ বহু বুদ্ধিজীবী, এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

(চৌদ্দ) "তাহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বাড়াবাড়ি করিলে····।" এর উত্তরে আমাদের বলার কিছুই নেই। আল্লাহ্‌ই আমাদের হাফেয ও নাসের। যুগে যুগে খোদায়ী জামা'তের দুর্বল লোকদেরকে যিনি রক্ষা করেছেন তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষক। পৃথিবীর ১২৬টি দেশে এই জামা'ত সুপ্রতিষ্ঠিত। একশত বৎসর যাবত এই জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শক্তিকে পর্যন্ত এই জামা'তের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র খাস মেহেরবানীতে এই জামা'ত প্রায় চার হাজার শাখা বিস্তার করে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার নানা দেশে বিস্তার লাভ করেছে। কোন বাঁধাই এই ঐশী জামা'তের গতি রোধ করতে পারে নাই!

আপনাদের নেতা বলেছেন, "বস্তুত দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠাতার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ হইয়া থাকে নাই, প্রকৃত ঈমান আনিয়া কেহই শান্তির ক্রোড়ে দিন কাটাইতে পারে নাই (তফহিম, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃঃ)

আপনি এদেশের তৌহিদী জনতার ভয় দেখিয়েছেন! অথচ, আপনাদের মতে এদেশের মুসলিম জনতা হল "ইহুদী বা খৃষ্টানদের অনুরূপ" (সিয়াসি কসমাকস, ৩য় খণ্ড, ১৩৩পৃঃ)। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী মুসলমানরা হল, "জাহেলিয়াতের উৎপাদন" (খোতবাত, ৭৬ পৃঃ)। আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আজ এদেরকে 'তৌহিদী' জনতা বানিয়ে দিলেন! চমৎকার কৌশল বটে!

(পনর) আহ্‌মদীরা জিহাদকে অস্বীকার করে।

এর উত্তরে জানাচ্ছি যে, আহ্‌মদীরা কখনও জিহাদকে অস্বীকার করে না। বরং দিনরাত

তারা কুরআনের মাধ্যমে সত্য প্রচারের জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তারা অস্ত্রের দ্বারা জিহাদকে বর্তমান অবস্থায় অস্বীকার করে। হাদীসে ছিল, ইয়াজারুলহারব। অর্থাৎ শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ যুদ্ধকে রহিত করবেন।

বর্তমানে যুদ্ধের জেহাদ করে যে কোন লাভ হয় না তাকি ইরান, ইরাক, সৌদী যুদ্ধের পরও বুঝিয়ে দিতে হবে? কৈ মক্কা মদীনার হেফাযতের জন্য তো আপনারা অর্থাৎ জেহাদীরা কেউ গেলেন না? মক্কা মদীনা রক্ষা করতে ডেকে আনলেন ইহুদী খৃষ্টান সৈন্য। আর তাদের মনোরঞ্জনের জন্য পবিত্র আরব ভূমিতে আমদানী করলেন নারী, শূকরের মাংস হাশিস, এইডস্ (দেখুন সংবাদ, ৯ই ভাদ্র ১৩৯৭, আগামী, ৮ মার্চ ১৯৯১, আল ইত্তেহাদ প্রভৃতি)।

শুনুন, আপনাদের গুরু জনাব মৌদুদী সাহেব জেহাদ সম্বন্ধে কি বলেছেন, "জেহাদ অর্থ শুধু যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড চালানোই নয়! বরং এই শব্দটি চেষ্টা, সাধনা, দ্বন্দ্ব ও চরম প্রচেষ্টা সম্পন্ন সংগ্রাম করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তফহিম, ৮ম খণ্ড, ২৯০ পৃঃ)। তিনি আরো বলেছেন্ "জিহাদ অর্থ কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য নিজেদের সমগ্র শক্তি চূড়ান্ত ভাবে নিয়োজিত করিয়া দেওয়া।.....যুদ্ধ বুঝাইবার জন্য কুরআনে 'কেতাল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (ঐ, ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)। আরো শুনুন, "মুখের ভাষা এবং কলমের জেহাদও জেহাদে কবীর (ঐ, ১০ম খণ্ড, ৪৮ পৃঃ) আহ্‌মদী জামাত সমগ্র বিশ্বে এই জেহাদে কবীর চালিয়ে যাচ্ছে। একশত বিশটি ভাষার কুরআনের অনুবাদ, ইসলামী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করে যুক্তি এবং ভালবাসা দ্বারা প্রকৃত ইসলাম প্রচার করে চলেছে। তারা কোন দেশের গদী দখলের জন্য ইসলামের নামে রাজনীতি করে না। দুর্বল শান্তিপূর্ণ মানুষের উপর যুলুম করে তার নাম জেহাদ রাখে না।

(ষোল) সব শেষে লেখক সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তিনি প্রেস কাউন্সিলকে দিয়েও আহ্‌মদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করিয়ে ছেড়েছেন। কি অদ্ভুত দাবী! একদিকে জামা'তে ইসলামীর সংসদ সদস্য সরকারী দলকে ছোট শয়তান এবং বিরোধী দলকে বড় শয়তান আখ্যা দিচ্ছে (ডন, ২৭/১০/৯১) অপরদিকে তারা তাদের কথিত 'শয়তান' দিয়ে আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে কাফের বানাতে চাচ্ছে। কিমাশ্চর্যম!

আমরা বাংলাদেশের সরকার এবং জাগ্রত জনসাধারণকে তথা কথিত এই জেহাদ পন্থীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসকে প্রতিহত করার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের দেশ ও জনগণকে সকল প্রকার অশুভ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন, পাকিস্তানী ষ্টাইলে এদেশের শান্তি বিনষ্টকারী অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করুন, আমীন। আমাদের একমাত্র নির্ভর সকল শক্তির আধার আমাদের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপর।

'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম'

যতীন সরকার

১৯৯১ সালের ২৭শে মে তারিখে অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী ও চিন্তা-উদ্দীপক একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভাটির উদ্যোক্তা ছিল 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' নামক সংগঠন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সিরাতুন নবী' বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন ও বাণী। অর্থাৎ চলতি কথায় এটি ছিল একটি ধর্মসভা। আরো স্পষ্ট করে বললে —ইসলাম ধর্ম বিষয়ক সভা। আর এ-রকম সভা যে হবে মূলতঃ মুসলমানদেরই সভা সে-ই তো সাধারণ চলতি রীতি। কিন্তু সেদিনকার ওই সভাটি চলতি রীতির ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল। সে সভায় আলোচকের তালিকায় শুধু মুসলমানরাই ছিলেন না, ছিলেন খৃষ্টান ধর্মযাজক এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুও। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তিও সে সভায় আলোচক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আর ইসলাম ও তাঁর পয়গম্বরকে কেন্দ্র করে কথিত বক্তব্যগুলো ছিল অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন চেতনায় দীপ্ত। ধর্মসভাগুলোতে সাধারণত যে রকম কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে, সে সভার বক্তাদের আলোচনা সে-রকম গতানুগতিক ছিল না। এ ধরণের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের দরুণই সভাটি অন্তত আমার মধ্যে, চিন্তার নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল।

অনেকদিন আগেকার পড়া নজরুলের একটি কবিতার পংক্তি সেদিন বার বার মনে পড়ছিল,— 'কেবল মুসলমানেয় লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম'। এ পংক্তিটির তাৎপর্য এর আগে তেমন করে উপলব্ধি করতে পারি নি। ইসলামের নবীকে বলা হয়ে থাকে 'রহমাতুল্লীল আলামীন'— সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই যদি হয়, তাহলে তো তিনি নিশ্চয়ই কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সম্পদ হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর অবদানের শরিক সম্প্রদায়-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষই।

কিন্তু সকলের মধ্যে এ বোধ সঞ্চারের চেষ্টা কি হয়েছে কখনো? মুসলমানরা কি অমুসলমানকেও মহানবীর উত্তরাধিকারী বলে মেনেছেন? অমুসলমানরা কি মহানবীর অবদানের উত্তরাধিকার লাভের কোনো গরজ অনুভব করেছেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যি একেবারে পুরোপুরি নেতিবাচক হবে বলে আমি মনে করি না। অন্তত আধুনিক কালের ইউরোপের অনেক অমুসলমান বিদ্বান বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গীবন তো ইসলামের অভ্যুদয়কে দেখেছেন একটি অবিস্মরণীয় বিপ্লব হিসেবে, এবং এ বিপ্লব পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই একটি নতুন ও স্থায়ী প্রভাবের স্বাক্ষর রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। ('One of the most memo-

rable revolutions which has impressed a new and lasting character on the nations of the globe')। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকের গোড়ায় ফরাসী দেশের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবী রোজার গরোদি ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে চমৎকার একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেই তিনি ইসলামের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ভূমিকার স্বরূপ উদঘাটন করে দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিবেশী রূপে বাস করেও যে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলমানদের (বিশেষ করে হিন্দুদের) ধারণা মোটেই স্বচ্ছ নয়, সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এককালের কমিউনিষ্ট বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে 'র‍্যাডিকেল হিউম্যানিষ্ট' রূপে খ্যাত মানবেন্দ্র নাথ রায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত The Historical Role of Islam নামক বইয়ে মানবেন্দ্র নাথ রায় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য উপমহাদেশের হিন্দুদের অভিযুক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়—No civilised people in the world is so ignorant of Islamic History and contemptuous of the Mohamadan religion as the Hindus···The current nation of the teachings of the Arabian prophet is extremely illinformed. The average educated Hindu has little knowledge of, and no appreciation for, the immense revolutionary significance of Islam, and the great cultural consequences of that revolution.

কথাগুলো সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু নিরঙ্কুশ সত্য নয়। কারণ, এদেশে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের ভগীরথ রামমোহন থেকে শুরু করে বেদান্তের নব ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মনীষীই ইসলাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। রামমোহনের ব্রাহ্ম মতের ওপর ইসলামের প্রভাব নিয়ে তো অনেক আলোচনাই হয়েছে। রামমোহন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর একটি জীবনী রচনারও সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। মহানবীর প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই জীবনাচরিত রচনার উদ্দেশ্য বলে তিনি তাঁর বন্ধু এ্যাডামকে জানিয়েছিলেন। কারণ, রামমোহনের মতে, 'মুহাম্মদের গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু ও সমালোচকগণ— কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেন নি'। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বৈদান্তিক হয়েও উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'বৈদান্তিক মাথা ও ইসলামিক দেহ' নিয়েই এদেশের সমাজ সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়', 'সমাজ' 'ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র সেন অমুসলমান হয়েও তো বাংলা পদ্যে প্রথম কুরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ ও মহানবীর জীবনচরিত রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং রামপ্রাণ গুপ্তও মহনবীর চরিতাখ্যান প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক বাংলায় ইসলাম চর্চার নিয়ত এরকম আরো বহু অমুসলমান মনীষীর নাম করা যেতে পারে। অবাঙালী অমুসলিম মনীষীদের মধ্যে ডক্টর তারাচাঁদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা তো খুবই প্রসিদ্ধ। আর মার্কসবাদী মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের ইসলাম চর্চার

পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে তাঁর 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন,' 'ইসলামের অজ্ঞতা ও রূপরেখা' ও সংস্কৃতি ভাষায় কুরআন শরীফের কিছু অংশের অনুবাদ প্রয়াসের মধ্যে।

তবু, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ক্ষোভ ও অভিযোগের যথার্থতা এখানে যে, তিরিশের দশকের শেষ দিকে তিনি যখন ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে গ্রন্থে রচনা করেছিলেন তখন এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে, এবং এই দুই সম্প্রদায়ের একে অন্যের বিষয়ে অজ্ঞতাকেই গৌরবজনক বলে মনে করেছে। পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক দুর্গম ব্যবধানের। মানবেন্দ্র নাথের মতো কিছু লোকের সাধু প্রয়াস এ ব্যবধান ঘোচাতে সমর্থ হয়নি। এরপর অর্ধ শতাব্দীরও অধিককালের মধ্যে এ উপমহাদেশের সমাজে ও রাষ্ট্রে অনেক ভাঙা গড়ার খেলাই চলেছে। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং বাঙালীরা রক্তের মূল্যে সে রাষ্ট্রের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়েও এসেছে। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-উপমহাদেশের এই তিনটি রাষ্ট্রের সবগুলোতেই মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়গুলো পরস্পরকে জানা বোঝা ও একে-অন্যের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিবর্তে অজ্ঞতা ও অবহেলাকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলিম মৌলবাদের প্রসার মুক্তবুদ্ধি ও কল্যাণ চেতনার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

এ রকম এক দুর্বিনীতকালে 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' সিরাতুন নবীর অনুষ্ঠানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের উদার আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষুদ্র হলেও মহৎ একটি প্রয়াসের সূচনা করলো।

মনে পড়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কথা। মাওলানার 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম' নামক বইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি অংশ 'প্রতি বছর ভারত বা পাকিস্তানের কোনো একজন অমুসলিম কর্তৃক ইসলামের উপর এবং মুসলমান কর্তৃক হিন্দু ধর্মের উপর দু'টি রচনার জন্য পুরস্কার হিসেবে' প্রদানের জন্য বরাদ্দ করা হয় তাঁর অন্তিম আকাঙ্খার প্রতি সংগতি রেখেই। এ-রকম উদ্যোগের সাধু উদ্দেশ্যটির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ দানে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সেই ব্যর্থতার প্রকট রূপই তো দেখি প্রতি বছর সরকারী-বেসরকারী প্রযোজনায় আয়োজিত 'ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেও। রহমাতুল্লীল আলামীন বলে খ্যাত মহানবীর জন্মদিনের এ-সব অনুষ্ঠানের কোনোটিই সম্প্রদায়ের গণ্ডি ভেঙে উদার বিস্তৃতি লাভ করে না; আবার মুসলমান অমুসলমানের কেউই অনুষ্ঠানগুলোর খণ্ডিত রূপ প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত হয় না।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অসচেতনতা, নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় সেক্যুলার রাজনীতিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। তাদের অসচেতনতা ও উদাসীনতাই ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তি জোগায়। সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিকরা মানুষের ধর্ম ভাবনার

পরিচয় না দিয়ে বা তাকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় বিধানে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীরা দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন না করেই সমাজ-প্রগতির স্বপ্ন দেখেন। ধর্ম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বা মতামত প্রদানের দায়িত্ব তাঁরা বহন করেন না। এরই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তারা। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষের কণ্ঠস্বর জনগণের কাছে খুব কমই পৌঁছে। বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মধ্বরা অনুদার ভাষ্য প্রচার করে ধর্মকে কুপমণ্ডুক বানিয়ে ফেলে, ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। সেক্যুলার রাজনীতি এ রকম পরিস্থিতিতে হালে পানি পায় না, প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

প্রথাগতভাবে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম অনুসারী, সে দেশে ইসলামের কোন্ ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জন সাধারণের ধ্যান-ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে গণচিন্তায় বিকৃতি-প্রতিরোধ ও সুস্থতা সঞ্চয়ের কর্মসূচী প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিকদেরই গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের যে বিপ্লবী ভূমিকার কথা গীবন কিংবা মানবেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সে ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি ফেরানো আজ সত্যসন্ধানীদের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। রোজার গারোদি কিংবা রাহুল সাংকৃত্যায়নের ইসলাম-ভাবনার ধারাবাহিকতাকে অগ্রসর করে না নিয়ে মার্কসবাদীরা এদেশের সমাজ প্রগতিতে কোনোই অবদান রাখতে পারবে না। উদার মানবতাবাদী ও মুক্তবুদ্ধি মানুষদের একান্ত বিচারশীলতার সঙ্গে আজ স্মরণ করতে হবে বিশের দশকের ঢাকার 'শিখা' গোষ্ঠির কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ চিন্তাবিদদের ইসলাম সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার কথা। সৈয়দ আমীর আলী বা স্যার সৈয়দ আহমদের ইসলাম ভাবনাও যুগের আলোতে পরখ করে দেখা প্রয়োজন। কারো ব্যাখ্যা-ভাষ্যই নির্বিচার অন্ধতায় মেনে নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আসল প্রয়োজন এমন পরিবেশ সৃষ্টির, চোখ-কান-মন খোলা রেখে সবাই যাতে প্রকৃত সত্যের সমীপবর্তী হতে পারে এ সত্যসন্ধানের উৎসবে সকল মতের, সকল পথের ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই ডেকে আনতে হবে।

এ রকম পরিবেশেই দেশে মৌলবাদ-মুক্ত আবহের সৃষ্টি হওয়া এবং সম্প্রদায়গত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ হওয়া সম্ভব। এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাও তখন পূর্বসূরি মনীষী রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ বা গিরিশ চন্দ্র সেনদের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার যথাযথ উত্তরাধিকার বহন করার দায় অনুভব করবে, এবং কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম—নজরুলের এই বাণীর অনুধাবন করবে।"

অধ্যাপক যতীন সরকার : কলাম লেখক ও প্রাবন্ধিক নাসিরাবাদ কলেজ (ময়মনসিংহ) বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। (২১/৯/৯১ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

'বিবিধ বচন'

"যতীন সরকারের লেখাটি আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম' শুধু এই চমকপ্রদ শিরোনামের জন্যই নয়, লেখার বিষয়-আশয় ও সমকালীন সংকটকে তুলে ধরেছে স্পষ্টভাবে-এ কারণেই লেখাটি ভালো লেগেছে।

একটী মাত্র 'সীরাতুন্নবী' সভার বদৌলতে ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে যতীন সরকারের মনে নব চেতনার জন্ম হয়েছে। এবং তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম'—কবি নজরুলের এই পংক্তিটির তাৎপর্য এর আগে তেমন করে উপলব্ধি করতে পারিনি। তিনি আরো বলেছেন, "ইসলামের নবীকে বলা হয়ে থাকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন'—সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বা আশীর্বাদ স্বরূপ। তাই যদি হয় তাহলে তো তিনি নিশ্চয় কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সম্পদ হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর অবদানের শরিক সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষই।" এ বোধ সঞ্চারিত হওয়ার পর যতীন সরকার নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু সকলের মধ্যে এ বোধ সঞ্চারের চেষ্টা কি হয়েছে কখনো? মুসলমানরা কি অমুসলমানকে মহানবীর উত্তরাধিকার বলে মেনেছেন? অমুসলমানরা কি মহানবীর অবদানের উত্তরাধিকার লাভের কোন গরজ অনুভব করছেন?

যতীন সরকার আজ যে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, তাতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবারই মাথা নত হয়ে যাওয়ার কথা। তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। 'মহানবী সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ'—এই একটি মাত্র চেতনাই যদি গোটা বিশ্বে সঞ্চারিত হতে পারতো তাহলে বোধ হয় বর্তমান পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে এতোটা দুঃখ ভোগ করতে হতো না। কিন্তু এই চেতনা তেমন করে সঞ্চারিত হল কই? এই ব্যর্থতার সিংহভাগ দায় মুসলমানদের ঘাড়ে এসেই বর্তায়। কোন খোঁড়া যুক্তি অবতারণার বদলে এখন মুসলিম নামধারীদের মাথা হেট করে থাকাই ভাল। তাতে করে লজ্জার মাত্রাটা অন্তত আর বাড়বে না।

দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সিরাতুন্নবী জলসা এবং বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের নামে দেশে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)-এর যে রূপ প্রকট করে তুলে ধরা হচ্ছে, তাতে করে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম কতটা সম্মানিত হয়েছে? এ সব সভার বক্তব্য, পরিবেশ এবং ধরণ-ধারণ থেকে মহানবী ও তাঁর ধর্ম ইসলাম কতটা মহিমান্বিত হয়েছে? এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক কোন্দল ও বিবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম আমার এই বক্তব্যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, ইসলাম ও তাঁর নবীর উপর ভাল সভা কি মোটেই হয় নি? হয়েছে, কিন্তু তাকে ব্যতিক্রম ধরলেই ভাল হয়। আর তা ব্যতিক্রম বলেই এমন সভার খবর আমাদের দেশে সংবাদ হয়ে যায়। আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, আমাদের দেশের ধর্ম সভাগুলোর সাধারণ

চরিত্রের কথা। ইসলাম যদি গোটা মানবজাতির জন্য হয় এবং ইসলামের নবী যদি 'রহমা-তুল্লিল আলামীন হয়ে থাকেন, তাহলে সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠানে শুধ মুসলিমরাই থাকবে কেন? আর অমুসলিমদের শুধু শ্রোতা হিসেবে নয়, ষ্টেজে আসন দিতেও তো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে তেমনটি ঘটে কই? ইসলামে যা-ই থাকুক না কেন, আমাদের দেশে মুসলমানদের আচরণ থেকে সাধারণভাবে মনে হয়, ইসলাম বোধ হয় কেবল মুসলমানদের জন্যই। এই পরিস্থিতিতে সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠানে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান বক্তা দেখলে আমরা অবাক হই, কৌতূহলী হই। এমন একটি অনুষ্ঠান দেখেই চমৎকৃত হয়েছিলেন যতীন সরকার। সে অনুষ্ঠানে তাঁকে ভাবিয়েছে এবং তা নিয়ে তিনি লিখতেও বাধ্য হয়েছেন পত্রিকার পাতায়। যতীন সরকারের উপলব্ধি মুসলমানদের এ কথাটিই আবার জানান দিয়ে গেল যে, ইসলামের আলোকে সত্যিকার অর্থে দেশকে, পৃথিবীকে গড়তে চাইলে ইসলামের সার্বজনীন রূপকে কথায় কাজ এবং সভা সমিতির মঞ্চেও পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। কারণ শুধু কথায় চিড়া ভিজবে না।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও প্রাণময় রূপ বর্তমান বিশ্বে সুস্পষ্ট না হওয়ার পেছনে মুসলমানদের ব্যর্থতা সিংহভাগ, একথা সত্যি। তবে এ ব্যাপারে অমুসলিমদের দায়ভাগও কম নয়। কারণ মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি। মানুষ তো তার বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে শান্তি ও কল্যাণের পথ বেছে নিতে পারে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ তো তাদের বিচার-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু ইসলামের বেলায় থমকে গেল কেন? সংকীর্ণ ধর্মীয় কিংবা গোষ্ঠীগত চিন্তা কিংবা প্রচলিত প্রথাই কি সে পথে বাধ সেধে বসে আছে? তাহলে মুক্ত বুদ্ধি গেল কোথায়? সব কিছুকে মুক্ত বুদ্ধিতে বিবেচনা করা গেলে ইসলামকে যাবে না কেন? পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা চাইলে অমুসলিম বন্ধুদেরও একটু উদার হতে হবে বৈকি!

অবশ্য ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে অমুসলিমরা যে একবারে কোন খোঁজ-খবর নেননি, তা কিন্তু নয়। তবে সেটা খোঁজ-খবরের কোন সাধারণ রূপ নয়, বিশেষ রূপ। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই সে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যেমন সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জর্জ বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন: "ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতা তথা শাসনতান্ত্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার ধর্ম। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খৃষ্টধর্ম তার মুকাবিলা করতে পারে না। কোন ধর্মের সমাজ ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় এতোটা পরিপূর্ণ নয়। মুসলিম জগতের অধঃপতন হচ্ছে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির ফল।" ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ গীবনও ইসলামের অভ্যুদয়কে একটি অবিস্মরণীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, "এই বিপ্লব দুনিয়ার সব জাতির মধ্যেই একটি নতুন ও স্থায়ী প্রভাবের স্বাক্ষর রেখেছে।"

আর ফরাসী দেশের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবী রোজার গরোদি'র কথা উল্লেখ করেছেন যতীন সরকার স্বয়ং। গরোদির ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্বীকার করে মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতেই ইসলামের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ভূমিকার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ধারণা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি পর্বতপ্রমাণ ফলে তা এই উপমহাদেশে অশান্তির এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালের কমিউনিষ্ট এবং পরবর্তী-কালের 'র‍্যাডিকেল হিউম্যানিষ্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'The Historical Role of Islam' গ্রন্থে সেই চিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর কোন সভ্য মানুষ হিন্দুদের মত ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে এতটা অজ্ঞ এবং মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি এতটা বিদ্বেষ-প্রবণ নয়।" এ হলো ইসলামের প্রতি উপমহাদেশের হিন্দু মনোভাবের সাধারণ চিত্র। অবশ্য এর বাইরে এমন হিন্দু মনীষীরাও আছেন, যারা ইসলাম ও তার নবীকে সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম।

এই ব্যতিক্রম দিয়ে কাজ চলবে না। তাই 'রহমাতুল্লিল আলামীন' যে নবী তাঁকে অনুধাবন এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যতি-ক্রমের বদলে অনুসরণের এই চিত্রকে সাধারণ চিত্রের রূপ দিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের দেশের সেক্যুলার ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। বিষয়টা যতীন সরকারেরও দৃষ্টি এড়য়নি। তাই তিনি বলেছেন: এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সচেতনতা, নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন সেক্যুলার রাজনীতিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের সচেতনতা ও উদাসীনতাই ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তি যোগায়। সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিকরা মানুষের ধর্মভাবনার পরিচয় না নিয়ে বা তাকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় বিধানে সেক্যুলরাজিম প্রতিষ্ঠা করতে চান; প্রগতি-কামী বুদ্ধীজীবীরা দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন না করেই সমাজ-প্রগতির স্বপ্ন দেখেন। ধর্ম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা বা মতামত প্রদানের দায়িত্ব তারা বহন করেন না। এরই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তারা।"

যতীন সরকারের এই বক্তব্য আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছে। এ দেশের সেকুল্যার রাজনীতিক এবং 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরা যে ইসলাম এবং মহানবীকে নিয়ে ভাবেন না, সে বিষয়টি তাঁদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আচরণ থেকেই বুঝা যায়। যতীন সরকার তাঁদের রোজার গরোদি কিংবা রাহুল সাংস্কৃত্যা-য়নের ইসলাম ভাবনার ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, নইলে তারা এ দেশের সমাজ প্রগতিতে কোনই অবদান রাখতে পারবেন না।

ইসলাম ও ইসলামের নবীর শিক্ষা অনুসরণ করতে গিয়ে সবাই মুসলমান হয়ে যাবেন, এমনটি আমরাও মনে করি না। মুসলমান না হয়েও ইসলামেরর শিক্ষা অনুসরণ করে সমাজে

কল্যাণময় অবদান রাখা সম্ভব কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যেন ইসলামে ভক্ত সেজে কেউ আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এবং বাধা সৃষ্টির সুযোগ কেউ না পায়। কারণ তাহলে যতীন সরকার, এম, এন, রায়, গরোদি নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য যিনি রহমাতুলিল আলামীন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর সেই মিশনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কথাটি বললাম এজন্য যে, আজ কাল ইসলামের নামে কিছু হলেই তাকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী কর্ম হিসেবে আখ্যা দেয়ার একটা প্রবণতা প্রকটভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক পঙ্কিলতা এবং ইসলামের সৌরভের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের কষ্টটুকু স্বীকার করতেও তারা নারাজ। আর মৌলবাদী বলতে যে কে কি বুঝাচ্ছেন, তা আন্দাজ করাও এখন মুশকিল। অতঃপর ধর্মের অধিকার অস্বীকার করা, অপর ধর্মাবলম্বীদের নিধন করা যদিও মৌলবাদিতা হয়, তাহলে আপন ধর্মের প্রভায় ও কল্যাণময় পৃথিবী গড়ার প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষ আবার মৌলবাদী হয় কি করে? এই দুই কর্মধারা ও প্রবণতা তো এক জিনিস নয়। অথচ কল্যাণ ও অকল্যাণের এই দুই ধারাকে হালে একই বিশেষণে বিশেষিত করছে কোন কোন মহল। এমন কর্ম সভ্য সমাজে চলে কি করে? 'সত্য সন্ধানের উৎসবে' সকল মতের সকল পথের ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে যারা ডেকে আনতে চায়, তাদের এ বিষয়গুলোর প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বৈকি!

সব জাতির মধ্যেই একটি নতুন ও স্থায়ী প্রভাবের স্বাক্ষর রেখেছে। ফরাসী দেশের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবী রোজার গরোদি'র কথা উল্লেখ করেছেন যতীন সরকার স্বয়ং। গরোদি ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্বীকার করে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেই ইসলামের সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমিকার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

(৫-১১-৯১ তারিখের দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)

কৃতী ছাত্র

মোঃ নজমুল আলম (রুমেল) পিতা :—জনাব দরবেশ মোঃ ওসমান আলী চলতি বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে এস, এস, সি পরীক্ষায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হতে ২টি বিষয়ে লেটার মার্ক সহ সর্বমোট ৭২৩ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে আই, টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নারায়ণগঞ্জ এর ছাত্র ছিল। সে দীন দুনিয়াবী উন্নতী এবং লেখা পড়ায় আরো অগ্রগতির জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

রফিউদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) এর জলসা অনুষ্ঠিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে নারায়ণগঞ্জ জামা'ত, কাফুরিয়া জামা'ত এবং নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ও অতি শান শওকতের সাথে সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত করেছে। এ জলসাগুলো সকলের জন্যে বা বরকত হোক।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর তালিমুল কুরআন ক্লাস ও চতুর্দশ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার খাস ফযলে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঢাকাস্থ ৪নং বকশী বাজার রোডের দারুত তবলীগে গত ১লা নভেম্বর হতে ৬ই নভেম্বর, ১৯৯১ইং—৬ দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে তালিমুল কুরআন ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এই ক্লাশে বাংলাদেশের ২৭টি মজলিস থেকে নিয়মিতভাবে ৩৭ জন আনসার অংশ গ্রহণ করেন। এই ক্লাশে পবিত্র কুরআন, হাদীস, ধর্মী মসলা-মসায়েল ইত্যাদি শেখানে ছাড়াও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কেতাবাদির উপরও আলোচনা হয়।

অতঃপর ৭ ও ৮ই নভেম্বর, ১৯৯১ইং—দু'দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র চতুর্দশ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদর মোহতরম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৭ই নভেম্বর সকাল ১০ ঘটিকায় ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। দারুত তবলীগ ময়দানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও আনসারুল্লাহর পতাকা উত্তোলনের পর কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। অতঃপর অর্থ ও সাধারণ বিষয়ের উপর বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে কায়েদ মাল জনাব কাশেম আলী খান ও ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব গিয়াস উদ্দীন আহমদ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করে দিয়ে বলেন, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা হচ্ছে জামাতের চালিকা শক্তি এবং মজলিসে আনসারুল্লাহর সদস্যগণ এর পরিচালিকা শক্তি। ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশনে ''সীরাতুন্নবী (সাঃ)'' ও ''তরবীয়তে আওলাদ'' এর উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে নায়েবে ন্যাশনাল আমীর-৩য় মোহতরম মকবুল আহমদ খান ও মোহতরম সদর সাহেব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী। অতঃপর ''আমি কেন আহমদী হলাম'' এই বিষয়ের উপর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন জনাব এ, কে, রেজাউল করীম, ডাঃ জালাল উদ্দীন আহমদ ও রাজশাহী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল। তৃতীয় অধিবেশনে ''ইসলামী অর্থনীতি'' ''আহমদীয়া

জামাতের দায়িত্ব'' এবং বারাকাতে খেলাফত'' —এই ৩টি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন, যথাক্রমে ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার সদস্য জনাব ওবারক আলী ও জনাব ওবায়দুর ভূঁইয়া। ৭ই নভেম্বর চতুর্থ অধিবেশনে শূরার সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় ও শূরার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই নভেম্বর ৫ম অধিবেশনে সকাল ৮-৩০ মিঃ হতে বেলা ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত বাজেট ও মজলিস সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই নভেম্বর দুপুর ২-৩০ মিঃ হতে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ''সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ),'' ''তালিমুল কুরআনের গুরুত্ব,'' ''মুসলমান কে?'' ''আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য'' এবং ''নামাযের গুরুত্ব''—এই ৫টি বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, সদর মুরব্বী মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব, সদর মুরব্বী মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। প্রধান অতিথির সমাপ্তি ভাষণে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বর্তমান যুগের নৈতিক অবক্ষয় ও এ ব্যাপারে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে মোহতরম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব এই বলে আল্লাহতা'লার শুকরিয়া আদায় করেন যে, তিনি তাঁর অসীম কৃপায় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের তালিমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। আনসারগণকে তাদের দায়িত্ব পালনে আরো অধিক তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। অতঃপর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী চতুর্দশ বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নাজির আহমদ ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি

স্থানীয় জামা'তের জ্ঞাতব্য

স্থানীয় জামা'তে সালানা জলসার তারিখ নির্ধারণকল্পে নিম্নলিখিত সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেসব জামা'ত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী তাদেরকে এই কমিটির সাথে যোগাযোগ করে তারিখ নির্ধারিত করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে:

কমিটি

(১)	জনাব এন. এন. মোহাম্মদ সালেক,	চেয়ারম্যান
(২)	,, গিয়াসউদ্দিন আহমদ,	সেক্রেটারী
(৩)	,, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া,	সদস্য
(৪)	,, মোহাম্মদ আবদুল হাদী.	,,
(৫)	,, মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	,,

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

খোদ্দামের সংবাদ

সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা '৯১তে রাজশাহী মজলিসের ১৫জন আতফাল খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, লিখিত পরীক্ষায় দ্বিতীয়, পয়গামে রেসানী দলীয় ভাবে প্রথম এছাড়া আতফাল লিখিত পরীক্ষায় ১ম ও ৩য় স্থান, বড় আতফাল ফুটবলে রানার্স আপ এবং সেরা খেলোয়ার তিন জনের বিশেষ পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়ে বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরেছেন (আলহামদুলিল্লাহ)

বিজয়ীদেরকে নিয়ে ২৫-১০-৯১ইং বাদ জুমুআ এক 'সম্বর্ধনা' সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতির দায়িত্ব নেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরম আঃ জলিল সাহেব। যোগদানকারী জনাব আবদুল্লাহ সামস্ বিন তারিক, জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী এবং খাকসার ইজতেমার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। এতে প্রায় ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ হোসেন খাঁন, জেলা কায়েদ

তালীম তরবীয়তি সভা অনুষ্ঠিত

তেরগাতি জামাত

গত ২৯-৯-৯১ইং তারিখে অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে তালিমী ও তরবীয়তি মিটিং এর আয়োজন করা হয়। জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে দোয়ার দ্বারা উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় মেহমান জনাব খন্দকার আনু মিয়া, সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মিটিং এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত মিটি-এ লাজনাসহ প্রায় ৬৫ জনের মত উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, মহিলা ও পুরুষ ১০ জন অ-আহমদীও উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম

বীরপাইকশা জামা'ত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ৩০-৯-৯১ইং তারিখে কেন্দ্র হইতে এক ঝটিকা সফরে মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ও তাঁহার সফর সঙ্গী জনাব খন্দকার আনু মিয়া মৌঃ মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম (তেরগাতী) ও মৌঃ নজরুল ইসলাম সাহেব আসেন। এ উপলক্ষ্যে ১-১০-৯১ তাং অত্র জামা'তে এক তরবীয়তি মিটিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জবাব ডাঃ আবদুল হাকিম। এতে বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব খন্দকার আনু মিয়া, সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব ও সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দোয়ায় মাধ্যমে মিটিং এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ শফিকুল হাকিম (শফিক)

আহমদনগর জামা'ত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগরের দারুল হাসেম মহল্লায় গত ৫/১১/৯১ইং তারিখে বিকাল ৩টা হইতে মাগরেব নামাযের সময় পর্যন্ত এক "তালীম ও তরবীয়তি সভার"

আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জামাতের আনসার খোদ্দাম আতফাল লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট প্রায় ২৩২জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৩জন গয়ের আহ্‌মদী ভাইও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব মৌঃ আহসান উল্লাহ পাটওয়ারী, মৌঃ সালেহ আহমদ মৌঃ বশিরুর রহমান, জনাব শরীফ আহমদ, জনাব আব্দুল মাউলা। সভাপতিত্ব করেন মহল্লা সেক্রেটারী জনাব গোলাম আহমদ মীর সাহেব।

শুভ বিবাহ

গত ৮/১১/৯১ইং তারিখ বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে আমার পুত্র মোয়াল্লেম মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান-এর সাথে রংপুর মাহিগঞ্জ জামা'তের জনাব কুদ্দুস সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ শামসুন্নাহার বেগমের সহিত ১০,০০১ (দশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়ে পড়ান সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব।

এ বিয়ে যাতে সকল দিক থেকে বরকতময় হয় সে জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম প্রধান, আহমদনগর

সন্তান লাভ

গত ১৮/৯/৯১ তারিখ বেলা ১১টার সময় আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম পুত্র ইব্রাহীম আহমদের ন্যায় এই পুত্র সন্তানটিও ওয়াক্‌ফে নও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হুযুর (আইঃ) নবজাতক পুত্রের নাম রেখেছেন তাওসীফ আহমদ। নবজাতক ও তার মা'এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

কাওসার আহমদ, লাইব্রেরীয়ান

দোয়ার আবেদন

ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অত্যন্ত মোখলেস আহ্‌মদী জনাব অধ্যক্ষ আজহার আলী খাঁন সাহেব অত্যন্ত কঠিন মোখালেফাতের ভিতর দিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। তাহা ছাড়া পরিবারটির বিভিন্ন পেরেশানীও রহিয়াছে।

জামা'তের বন্ধুগণের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁহাকে পারিবারিক এবং জামাতী সকল প্রকার পেরেসানী হইতে রক্ষা করেন।

হোসেন আহমদ, মোয়াল্লেম

(অবশিষ্টাংশ ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পাঠক পাঠিকাগণ দৃষ্টি দিন!

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'পাক্ষিক আহ্‌মদী'। এর অংগ সৌষ্ঠব ও মানগত গুণ সংরক্ষণ ও উন্নতি অনেকাংশে আপনারা সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। আশা করি আপনি আপনার দায়িত্ব উপলব্ধি করতঃ নিম্নলিখিত তথ্য বিবরণী পূরণ করে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন :

(১) আপনি রীতিমত পত্রিকাখানা পাঠ করেন কি? হাঁ/না

(২) আপনি কি পত্রিকার সৌজন্য কপি পান? হাঁ/না

(৪) আপনি বর্তমান (১৯৯১-৯২) বছরের চাঁদা দিয়েছেন কি? যদি দিয়ে থাকুন তবে রশিদ নং.....তারিখ.....

(৫) যদি বর্তমান বছরের চাঁদা (৪৮/-) না দিয়ে থাকেন তবে এখন পাঠান এবং মনিঅর্ডার নং.....তারিখ ..... পোষ্ট অফিসের নাম.....উল্লেখ করুন।

(৬) অনিবার্য কারণে এখনও আমরা আপনার বকেয়া চাঁদার হিসাব করতে পারিনি। বকেয়া নির্ধারিত হলে আপনি তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৭) আপনার নিকট থেকে উপরোক্ত তথ্য বিবরণী না পাওয়া গেলে আমরা বুঝব যে, আপনি 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' পাঠে অনিচ্ছুক। তাই জানুয়ারী '৯২ থেকে আপনার নামে পত্রিকা পাঠানো হবে না।

আপনার নাম ঠিকানা লিখুন

নাম.....

ঠিকানা.....

.....

.....

বিঃদ্রঃ—আগামীতে আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের জন্যে একটি নম্বর নির্ধারণ করবো। আমাদের সাথে যোগাযোগের সময়ে উক্ত নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা
৪নং বকশীবাজার রোড,
ঢাকা—১২১১
ফোন :—৫০১৩৭৯

নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের—সমগ্র মানবমণ্ডলীর। তাই তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁকে জানতে হলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একই সাধারণ মঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। এ ধরণেরই একটি মঞ্চে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করেছিলেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের যুব সংগঠন মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ ২৭শে মে, '৯১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে। এতে অধ্যাপক যতীন সরকার ছিলেন অন্যতম নিমন্ত্রিত অতিথি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত সংগঠন ১লা নভেম্বর '৯১ তারিখে ৪নং বকশী বাজারে 'সর্বধর্ম সম্মেলন' নামেও অনুরূপ একটি সাধারণ বক্তৃতা মঞ্চের আয়োজন করেছিলেন। এতে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বজনমান্য পণ্ডিতবর্গ নিজ নিজ ধর্মের প্রবর্তকদের জীবনচরিত উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁরা কেউই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁরা সবাই যেন একই মালার ফুল বিশেষ। মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার অক্ষয় সেতু বন্ধন রচনা করার জন্যেই তাঁরা এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন ধর্ম বা মতাদর্শের লোকেরা যত বেশী এহেন সাধারণ মঞ্চের তথা 'সত্য সন্ধানের উৎসবের' আয়োজন করবে তত বেশী সংশ্লিষ্ট সকলে মন, মানসিকতা ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টি ভঙ্গীর কাছাকাছি হবেন; ফলে হীন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলো একে অপরকে চিনতে পারবে আর তা হবে দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে ধর্মে-ধর্মে শান্তি স্থাপনের এক বিরাট পদক্ষেপ—অব্যর্থ মাইল ফলক।

(৪৫ পাতার পর)

শোক সংবাদ

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সাহেব ৭ই এপ্রিল '৯১ রোজ রবিবার সকাল ৭টায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি রিকাবী বাজার আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ৬০ বৎসর। জনাব মোশাররফ হোসেন সাহেব কয়েক বৎসর যাবত ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র এক কন্যা, স্ত্রী, মা, দুই ভাই, চার বোন এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, রেকাবী বাজার

অনিবার্য কারণে ৩০শে নভেম্বরের সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে পারব না বলে দুঃখিত। তজ্জন্য এ বারের সংখ্যা একটু বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদক

ভুল সংশোধন

'সত্যবাকের মিথ্যা ভাষণ' নামক প্রবন্ধে ১ম পৃষ্ঠার ১০ নং লাইনে ১৮৫৯ এর পরিবর্তে ১৯৫৮ হবে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

15th November, 1991

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan